আমার জীবন-কথা কিছু ব'লে যাই

শ্রীঅভয়

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশিকা
দৈবী দেবী (অর্চনা দত্ত)
কীর্তন কুটির
বাঘাযতীন বাজার
রিজেন্ট এস্টেট
কলিকাতা-৭০০০৯২

মুদ্রাকর
শ্রীভারতী প্রেস
৮১/৩এ, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৭

পরিচ্ছেদ—১

আমার জীবন-কথা বলতে শুরু করেছি অনেকদিন। একটা একটা ক'রে দুটি খণ্ড লেখা হয়ে গেছে। ছাপানোও হয়ে গেছে। এবারে তার পরের খণ্ড লেখবার চেষ্টা করছি।

কথা তো অনেক কিছুই আছে। কথার তো কমতি কিছুই নেই। বিস্তর কথা। অজস্র ভাব। কথার পরে কথা আমি গাঁথছি। আমার জীবনের কিছু ছবি আমি যে রেখে যেতে চাই।

হ'তে পারে মালা ঠিক মত গাঁথা হচ্ছে না। তা না হ'লেই বা কি। আমার জীবন থেকে ফুল পাচ্ছি যথেষ্ট। ফুল পাচ্ছি, মালা গাঁথছি। মালা গাঁথার মত ফুল অনেক। কিন্তু ঠিক মালা গাঁথার মত কি আছে? আমার মনে হয় আছে। সাজিয়ে গুছিয়ে মালা গাঁথলেই হ'ল। সাজিয়ে গুছিয়ে গাঁথলে নিশ্চয় একটা মালা গাঁথা হয়ে যাবে। অসুবিধার কিছুই নেই। শুধু সুন্দর ক'রে গাঁথলেই হবে।

মালা আমি গাঁথছি। যেমন পারি তেমন গাঁথছি। একটা কিছু খাড়া হবে তো বটেই। তেমন যদি না-ও হয় তাতেই বা কি। যেমন তেমন হ'লেই বা কি। যা পাই তা-ই কুড়িয়ে শুধু মনটা দিয়ে মালা গাঁথব। তরকারীতে যেমন নুন ঠিকমত হ'লে তবেই 'তার' হয়, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমন ফুলের পর ফুল সংগ্রহ ক'রে প্রিয়ের গলায় পরাবার মত একটা মালা হ'লেই হ'ল। শুধু অন্তরের আন্তরিকতাটুকু যেন বাদ চ'লে না যায়। ওইটুকু থাকাই প্রয়োজন। বাস্ তাতেই চলবে, মালা যেমনি হোক্ প্রিয় এগিয়ে এসে মাথাটি একটু নত ক'রে সেই সে মালা পরবেন। পরবেনই পরবেন।

এইটুকুরই তো দরকার ছিল। আর কিছুর তো কোনো রকম প্রয়োজন কোনোখানেই নেই। আমার চিন্তা এই রকম চিন্তা।

এ পর্যন্ত এই পুস্তকের যতটা আমি লিখেছি অথবা বের করতে পেরেছি প্রায় সমস্তটাই আমি বলেছি। হাতের লেখায় লিখেছে আর একটি

চ'লে গেল। এদিকে সংসারের দিক থেকে কিছুই আমি করছি না, কিছুই আমি দিচ্ছিও না। দিনের পরে দিন কেটে যাচ্ছে। আমার কোনো চিন্তাই নেই। আমার ধরনটাই ছিল ওই একরকমের।

বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের দিনগুলো কেটে যেত একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে।

তৃণার দাদা মুকুটবাবুর সঙ্গে আমার দেখা খুব কমই হ'ত। মাঝে মাঝে এক আধবার তাঁর দেখা পেতুম বটে। ওই বাড়ীর থেকে সামান্য দূরে উর্মিলা সরকারের বাড়ী। উর্মিলা মাও মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসতেন।

প্রতিটি সন্ধ্যাবেলায় আসর বসত। এ কথা, সে কথা, ভাল কথাই সব। তবে একটু আধটু হাসিগল্পও যে হ'ত না তা নয়।

যে-কথা বলছি সেটা রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের পরের কথা কিন্তু। আমাদের মধ্যে অনেক কথাই হ'ত। একটি ভদ্রলোক আসতেন তাঁকে তৃণা ওরা কী যেন ডাকতেন। হয়তো মামা ব'লে ডাকতেন। মামাই ধরি। তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মাঝে মাঝে এ কথা, সে কথা বলতেন।

বাড়ীতে আমি রয়েছি। এ ভাবে দিনের পরে দিন কেটে যায়। আমার মনে হয় সর্বশুদ্ধ তৃণাদের বাড়ীতে এ ভাবে ছিলাম মাস চারেক। সেও একবারে নয়। ঘুরে ফিরে।

শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া খুবই ভাল লাগে। অন্য দিক বাদ দিয়ে বলছি, শান্তিনিকেতনে এমন একটি আবহাওয়া আছে—যার তুলনা আর কোথাও বড় একটা পাই না। ময়লা মাটি সব জায়গাতেই আছে। সমাজে যেমন আছে, ঘরে বাড়ীতেও তেমন আছে। ধুলো আছে, ময়লা আছে, সবই আছে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের আবহাওয়াতে কেমন একটা নতুনত্বের আমেজ আমি পাই। সেটা সংসারে সব জায়গাতে পাই না।

এবারে আমি একটা কাহিনীতে আসি। অনেকদিন আগেকার একটা

ভূতের গল্প বটে। তবে কিনা ভূতহীন ভূতের গল্প। চূড়ান্ত ভূতের গল্প ঠিকই, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভূতের দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। তখনও ঘটেনি এখনও ঘটেনি। সত্যিকারের ভূতের দেখা কোনোদিনই পাইনি।

পরিচ্ছেদ—৩

তখন আমি মা আনন্দময়ীর সঙ্গে আছি। মায়ের সঙ্গে ঘুরিফিরি, দিনের পরে দিন কাটাই, মাসের পরে মাস ! বছরের পর বছর।

একবার অনেকদিন আগে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম। সে কি আজকের কথা ? তখন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন আমার চোখে দেখা দেয়নি।

মায়ের সঙ্গে আছি। মায়ের ভাবই তখন মনে উপজীব্য। হেসেখেলে, খেয়ে এবং প'ড়ে বেশ সময় কেটে যায়। একবার গিয়ে উপস্থিত হলুম কোনো এক দেশী রাজার দেশে। এরকম অনেক দেশী রাজাই মায়ের ভক্ত ছিলেন।

যেখানে গিয়ে আমরা উপস্থিত সেটা সম্ভবত কোনো পাহাড়ী রাজার দেশ। যতদূর মনে হয়—অঞ্চল হিমালয়। যেখানেই যাই আর যেখানেই থাকি আমি প্রায় সর্বদাই থাকতাম যেন একটা ঘোরের মধ্যে। অনেক কিছুই ঘটত, অনেক স্থানেই ঘুরতাম।

কিন্তু আমার সেই ঘোর কাটত না। আমার তালেই আমি থাকতাম আনন্দে। আনন্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। একটা আনন্দের মধ্য দিয়েই দিনগুলো যেন কেটে যেত। আমার লক্ষ্যস্থল ছিল মা। না। মা-ও নয়। এখন বুঝতে পারি আমি যেন একটা স্রোতের টানে ভেসে যেতাম নিজের মধ্যে নিজে। সর্বদাই ভাসছি—এই ভাব। এখনও ভাসি বটে। কিন্তু সে আর এক রকম ভাসা।

ভূতের গল্প আরম্ভ করেছিলাম। গল্পটি শেষ করলেই বুঝতে পারবেন এ

গল্প ভূতের গল্পই নয়। আমার কাছে এ গল্প ভূতের বাইরের গল্প। ভূত নেই—সেই গল্প। হয়তো ভূতকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারব না। আমি বলি, ভূত থাকলে থাক্। ভূত থাকলে আছে। না থাকলে নেই। তবে আমাদের সমাজে, কাজকর্মের মধ্যে জীবনযাপনের মধ্যে ভূতের কোনো স্থান নেই। নেই, নেই, নেই।

তবে আছে কি? আছে কল্পনা, আছে আন্দাজ, আছে মনের খেয়াল। হাঁ, ভূত ব'লে একটা জিনিস কোথায় যেন আছে। সে থাক্। থাকে তো থাক্ না।

কলকাতায় আগেকার দিনে অনেক বনবাদাড় ছিল। খেতখামারও ছিল। মধ্য কলকাতা ছাড়া অন্যত্র এই সেদিনও ছিল। দেখতে দেখতে কলকাতা জ'মে উঠেছে। তবে আমাদের ছেলেবেলায় যেখানে বাস করতুম সেইখানটাই মধ্য কলকাতা। সেই সব জায়গাতে— অপর জায়গাতেও কোনোদিন কোনোস্থলেই ভূতের সাক্ষাৎকার পাইনি। অনেকে পেয়েছে। কত কত লোকের মুখে ভূতের গল্পও অনেক শুনেছি। অনেকে না কি চাক্ষুষ দেখেছে। এর উত্তরে আমি শুধু হাসি, অন্তত হাসতে চাই আমি।

যে কাহিনীটা বলছিলুম সেখানে এবার ফিরে যাই। সেই কোন্ এক রাজার দেশে আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে আমরা গিয়ে উঠেছি। হয়তো ভূত তাড়ানোই সেই রাজবাড়ীর একটি উদ্দেশ্য। কে জানে কি। আমরা গিয়ে শুনলাম রাজবাড়ীর অমুক ঘরে রাত্রি যাপন করলে আর রক্ষে নেই। নির্ঘাত ভূতে ধরবে। যে-ঘরটাতে বিশেষ আশঙ্কা—আমি সেই ঘরখানাই নিলুম শোবার জন্য।

একখানা ঘরে আমি দিব্যি শুয়ে আছি। হয়তো বা একটু আধটু গা ছম্‌ছম্ করছে। গা ছম্‌ছম্ করে করুক। আমি তবু শুয়ে আছি। ওই ঘরখানাই কিন্তু ভূতের ঘর। আমার এখন আর তেমন কিছু মনে নেই। শুধু এটুকু মনে পড়ছে—আমি একলা সেই ঘরে শুয়ে বেশ ঘুম দিলুম। দিব্যি সকাল হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত মনে ঘুম থেকে জেগে আমি নিজেকে দেখতে পেলুম safe and sound. ভূত তো দূরের কথা, ভূতের কোনো

আভাসও দেখতে পেলাম না। যেমন রাত্রিতে শুয়েছিলাম তেমনই সকাল-বেলায় উঠলাম। তবে হলফ্ ক'রে বলতে পারব না আমার গা ছম্ছম্ করেনি একটুও। হয়তো করেছে। করলে করেছে। এটুকু মনে আছে, সকালবেলায় আমি দেখতে পেলাম দিব্যি ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছি।

ওদেশে ওই সব স্থানে ভূতকে বলে নর্সিং। কোনো অপদেবতা বা ওই জাতীয় কোনো কিছুর সম্বন্ধে বলতে গেলে মানুষ বলে নর্সিং। নর্সিং কথাটার মানেই এই, ওই সব অঞ্চলের কোনো অপদেবতা।

ভূত আর ভূত। ভূতের নিকুচি করেছে। ছেলেবেলার থেকেই ভূতের গল্প শুনে আসছি। খুব বেশী না শুনলেও নিতান্ত কম শুনিনি। আমার মনের গঠনটা অন্যরকম ছিল ব'লেই ভূতের কাহিনী আমাকে ধরত না বেশী। আমার কাছে ওসব গল্প তেমন কিছু পাত্তাই পেত না।

একবার একজনকে এ সব কথা বলছি। তাতে সেই ব্যক্তি বললেন, কি আশ্চর্য, ভূত দেখেন নি আপনি? ভূত আছে এবং আমি দেখেছি। আমি বললুম, সে কি প্রকার?

ভদ্রলোক অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আমাকে বললেন, এক গাছের এক ডালে একটা পা আর এক গাছের আর এক ডালে আর একটা পা। আমি নিজে দেখলুম দাঁড়িয়ে আছে।

আমার কথা বলি। আমি কিন্তু অবিশ্বাস করিনি। এখনও আমি অবিশ্বাস করি না। সে নিশ্চয় কিছু দেখেছে। তবে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, সমস্তই মনের খেলা। যতই যা দেখ আর যতই যা শোনো সমস্তই মনের কাণ্ডকারখানা। আর কিছুই নয়। সে তার মনকেই দেখেছে। আর কিছুই সে দেখেনি।

আমি তো মনে করি, এই জগৎ মাঝে আপন আপন মনকেই মানুষ দেখে, আর কিছুই দেখে না। তাই আমার ধারণা, এই বিচিত্র দুনিয়ায় সব্বাই নিজের নিজের বিশ্বকে দেখতে পেয়ে হাবুডুবু খায়। জগৎ আসলে একটা জগৎ নয়। দু পাঁচটা জগৎও নয়। বলা যায় অন্তহীন জগৎ।

যা চ'লে যায় তাকেই জগৎ বলে। সিনেমার ছবির মত জগৎ স'রে

স'রে যায়, এই স'রে যাওয়াতেই জগৎ। যেন ছবির পরে ছবি স'রে যাচ্ছে।

দেখছে কে? দেখছি আমি। আমার চোখের সামনে স'রে যাচ্ছে ছবির পরে ছবি। ঘ'টে যাচ্ছে হাজার হাজার ঘটনা। অবিশ্রান্ত। যেন একটি reel চলেছে।

আমরা তার মধ্যেই খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি গল্প করছি, তলিয়ে যাচ্ছি ভেসে উঠছি।

এবার কিন্তু আর একটা প্রসঙ্গে আসছি। মনে পড়ে হরিদ্বারে এক ডাক্তারের বাড়ীতে আমরা রয়েছি। সামনে পূর্ণ কুম্ভ। আমরা থাকি গঙ্গারই একেবারে ধারে একখানা বাড়ীতে। সেই বাড়ীর নাম পীতকুঠি।

মায়ের অর্থাৎ আনন্দময়ী মায়ের তখন এক অসুখ চলেছে। মায়ের হঠাৎ সেই অসুখ। শুনেছি মাকে মশা কামড়েছিল। সেই মশাতেই বহন ক'রে এনেছিল অদ্ভুত এক রোগের বীজাণু। একদিন জ্বর আসত, মাঝখানে দুটো দিন বাদ যেত, পরের দিন আবার সেই রকম জ্বর আসত। ওখানকার লোকে বলত, এই জ্বরের নাম চৌথা জ্বর। আমি কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম। আমার মনে হ'ত, এই জ্বর তো চৌথা জ্বর নয় বরং এই জ্বরের নাম বলা যায়, তিসরা জ্বর। দুদিক দিয়ে দুটো কথাই বলা যায় হয়তো। তবু আমার দিক থেকে আমি মনে করতাম, এই জ্বরের ঠিক নাম দেওয়া উচিত—তিসরা জ্বর।

জ্বর চলছে। মা একখানা ছোট চৌকির উপরে শুয়ে থাকতেন। তখনও ডাক্তারের সেই বাড়ীতে আমরা আসিনি। আমরা রয়েছি অন্য জায়গায়। আমার মনে পড়ে, চৌকির উপরে মা শুয়ে ঠক্ঠক্ ক'রে কাঁপছেন। যেন দূরের থেকেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

তখন শীতকাল। এদিকে জ্বরের প্রবল প্রতাপ। বেশী লোক নেই মায়ের কাছে। আমি তো কম্বলাবৃত মায়ের পা দুখানার ওপরে প'ড়ে রয়েছি কিছুক্ষণ। দেখি জ্বরটাকে একটু দাবিয়ে রাখা যায় কি না। তখন আমার বয়স খুবই কম। অতশত বোঝবার বুদ্ধিও নেই।

এইভাবে কিছুদিন গেল। জ্বর আর কমেই না। দিনকে দিন মা যেন কাবু হয়ে পড়েছেন। শেষকালে কি হ'ল, ডাক্তার পম্বের দেওয়া এটেব্রিন নামক ওষুধ খেয়ে মায়ের জ্বর থেমে গেল। জ্বর থেমে গেল বটে, তবে মায়ের শরীরের দিক থেকে এল এক দারুণ সংকট।

মা ঠিক সেই সময়টায় কতদিন কোথায় ছিলেন সে কথা আমার মনে আসছে না পরিষ্কার ভাবে। এটুকু স্পষ্ট মনে আছে মা ছিলেন দেরাডুন, হরিদ্বার অথবা কাছাকাছি কোথাও। দেরাডুন বলতে আমি রায়পুরকেও লক্ষ্য করছি। রায়পুর দেরাডুন থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোট একটি গ্রাম। সাধাসিধে ধরনের সব মানুষ সেখানে। আমার সেই সময়কার চোখে খুব ভালই লাগত। শুনেছি রায়পুর না কি অনেকগুলো আছে। আমাদের এই প্রসঙ্গটা দেরাডুন রায়পুরে।

আমি যেন তখন এক ঘোরের মধ্য দিয়ে চলতাম। রায়পুরের সেই সব দৃশ্য—সেই সব কথা আমার মনের চোখে ভাসছে দূরের একটা ছায়াছবির মতো। সেই গ্রাম, সেই একটা নহর। নহর মানে জলের একটা ধারা। বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে—সেই ধারা। যতদূর গেছে ততদূরই মনে হয় বাঁধানো। আমার কেন জানি না সমস্ত কাহিনীটাই যেন একটা স্বপ্নের মতন লাগে।

হ্যাঁ যেখানকার কথা বলছিলুম। ১৯৩৭/৩৮ সালে যে কুম্ভ হয়েছিল, সেই সময়কার ঘটনাই আমি বলছি। পূর্ণকুম্ভ। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। ঠিক সেই পূর্ণকুম্ভের মুখে আমি আনন্দময়ীমার সঙ্গে হরিদ্বারে গিয়ে উপস্থিত।

গিয়েই দেখলাম, চারিদিকে বিরাট সমারোহ। সাধুসজ্জন এবং ধর্মার্থী নরনারীর আশ্চর্য একটা মিলনক্ষেত্র। দেরাডুনের রায়পুব গ্রাম থেকে আমরা এসে উপস্থিত হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভের সমাবেশে। অনেকেই জানেন, দেরাডুন থেকে হরিদ্বার বেশী দূরবর্তী নয়। একশো মাইলের থেকেও অনেক কমই হবে। আমার মনে পড়ছে, যাওয়ার পথটুকুতে রেললাইনের উপর গোটা দুয়েক সুরঙ্গ অথবা টানেল পড়ে। তখন তো এইরকমই ছিল। এখন অর্ধশতাব্দী পরে কি রয়েছে অথবা হয়েছে তা বলতে পারি না।

হরিদ্বার থেকে দেরাডুন সামান্য কয়েক ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। সেই দেরাডুনের অতি অল্প দূরেই রায়পুর গ্রাম। খুব কাছেই দেরাডুন শহর। সেই দেরাডুন শহরের আর একটা দিকে কিষণপুর নামক জায়গায় মায়ের আর একটি আশ্রম আছে। যে রাস্তা দেরাডুন থেকে মসূরী পাহাড়ের উপরে চ'লে গেছে সেই রাস্তাতেই কিষণপুর গ্রামখানা। সেই কিষণপুরেই মাতা আনন্দময়ীর আশ্রম। ওই আশ্রমেই আমার জীবনের অনেক সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে।

তখন ওই অঞ্চলে লোকজন খুব কমই ছিল। পরে আশেপাশে অনেক মানুষের বসতি হয়েছে। বসতি শুধু নয়, ঘন বসতি।

কিছুটা দূরে আমাদের সেই রায়পুর। কয়েক মাইল মাত্র দূরে। পরে ওই রায়পুরে অনেক কিছু ঘ'টে গেছে। আমি যেন কথায় কথায় পূর্বেকার সেই রায়পুরেই চ'লে গিয়েছিলাম। এখন কিন্তু সেই রায়পুর আর নেই। আমি নিজেই পরবর্তীকালে রায়পুর গ্রামে গিয়ে কত কত পরিবর্তন দেখে এসেছি। যুদ্ধের কারণে অথবা অন্য কারণে সমস্তই যেন হয়ে গিয়েছে এক থেকে আর। তবু কয়েকটা জিনিস সেই রকমই রয়েছে। রয়েছে মানে কি? মানে তখন ছিল, সেই কথা বলছি। এখনকার ইতিহাস তো তারও পরবর্তীকালের ইতিহাস। ইদানীং বহুকাল তো ওই দিকে যাইনি। ইদানীং কেমন হয়েছে কে জানে?

এখন রায়পুরে সেই নিমগাছের নিকটবর্তী সেই মন্দিরটি কি ঠিক সেই রকমই আছে? হয়তো নেই। মনে পড়ে সেই মন্দিরে সেই শিব ব'সে আছেন। সম্মুখেই সেই বিরাটরকম ছাদের মত জায়গা। ছাদ নয় কিন্তু। পাহাড়ের উপরে, পাহাড়েরই গায়ে একটা চত্বর। সেও মন্দ নয় একেবারে। বেশ বড় জায়গা। আশ্রমের যাবতীয় খাওয়া দাওয়ার সমারোহ বেশীর ভাগ সেইখানেই নিষ্পন্ন হ'ত।

সেই চত্বরের একদিকে একটা নিমগাছ ছিল। বেশ বড় নিমগাছই বলতে হবে। তারই সামান্য দূরে ছিল এক বড়সড় লতানে গাছ। তাতে সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটত। সেই সব ফুলে মনমাতানো অপূর্ব গন্ধ।

আমি অনেক সময় সেই ফুল সংগ্রহ করতাম অনেকগুলি। তারপরে মায়ের ঘরে গিয়ে মায়ের বালিশের আশেপাশে সেই ফুল রেখে দিতাম। কোনো সময় রাখতাম বেশ প্রচুর। গন্ধে ঘর ময়ময় করত।

এখন কি জানি কেন সেই ভাব আর নেই। তা তো থাকবেই না। তা কেমন ক'রে থাকবে। সতের আঠের বছরের ভাব উনসত্তর বছর বয়সে কেমন ভাবে থাকে। না থাকাটাই সহজ এবং স্বাভাবিক।

তবু সব কথা যেন মনে প'ড়ে যায়। সেই ফুল সংগ্রহ—সেই মায়ের বালিশের পাশে রাখা—সেই অনেক কিছু। সেই সময়ে আমার জীবনের মধ্যে এসে পড়ল একটি মেয়ে। মেয়েটি এলাহাবাদ ইউনিভারসিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে অল্প দিন। আনন্দময়ী আশ্রমের বিশেষ থেকে বিশেষ একজন প্রাচীন দিদির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত।

শুনেছিলাম তার হয়েছিল টি. বি। তখন না কি তার সেই রোগ চ'লে গেছে অথবা arrested. একটা কথা ব'লে রাখি, তখন মা তো চক্রের মতো অনবরত ঘুরতেন। আজ এ জায়গা কাল ওই জায়গা, আজ এই শহর কাল ওই শহর। মায়ের ঘোরাঘুরির আর অন্ত ছিল না। আমি আসার পরও মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদা ঘুরতেন। আমি আসার কয়েক মাস পূর্বে জ্যোতিষবাবুর দেহত্যাগ হয়েছে। আলমোড়াতে।

অবশ্য আমি আগেই জ্যোতিষবাবুকে একবার দেখেছি। তার মানে জ্যোতিষবাবুর থাকাকালীন আমি একবার মায়ের কাছে এসেছিলাম। আমি নিশ্চয় তাঁকে দেখতে পেয়েছি। জ্যোতিষবাবুর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাদের চোখ আছে তাদের চোখ তাঁর উপর ঠিক পড়ত।

জ্যোতিষবাবুর কথা এসে গেল। মায়ের উপরে জ্যোতিষবাবুর ভাবের কথা আমরা যেমন শুনেছি তেমনটা এক আশ্চর্য কথাই বটে। মাকে তিনি মাতৃভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। মা ব'লেই মাকে ডাকতেন। প্রথম দিকে মায়ের কাছে যখন থাকতেন তখন তিনি থাকতেন সদাসর্বদা দণ্ডায়মান। কখনও অল্প কালের জন্যও তিনি বসতেন না। এ সব আমার পড়া অথবা শোনা কথা। প্রথম প্রথম মায়ের মুখে জ্যোতিষবাবুর অনেক কাহিনী

শুনতে পেতাম। জ্যোতিষবাবু মাকে নিয়ে অথবা মা জ্যোতিষবাবুকে নিয়ে একেবারে সুদূরে পাড়ি দিলেন। দেরাদুন। আরও কোথায় কোথায়। উত্তর কাশীও গিয়েছিলেন।

মায়ের তখন অপরূপ রূপ। উত্তর কাশী থেকে ঘুরে আসার পর দেরাদুন, রায়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে মা থাকছেন এবং কোথাও কোথাও কিছু দিনের জন্য বসবাস করছেন। তারমধ্যে রায়পুর একটি বিশেষ স্থান। এর পূর্বে মা রায়পুরে অতি সাধারণভাবে প্রায় বছর খানেক কাটিয়েছেন। সঙ্গে জ্যোতিষবাবু আরও এক আধজন। যেমন কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী। এসব কথা আমরা পরে শুনতে পেয়েছি।

রায়পুরের কথা মনে পড়লেই আমার অনেক কিছু মনের মধ্যে ভিড় করতে থাকে। রায়পুরে আমাদের দিকের পাহাড়ে দেখতাম পর পর কয়েকটা স্তর। সর্ব্বোচ্চ স্তরে পাঁচ সাতখানি ঘর তৈরী হয়েছিল পরবর্তী-কালে। সেই ঘরের একখানিতে মা গিয়ে থাকতেন। আর মা থাকলেই আমি কাছে আছি। প্রায়ই আমি আছি, মায়ের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনটাও কেমন যেন একটি সূত্রেই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল অন্তত তখনকার মতো হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় রামতারণবাবু, হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার—আমাদের কাছে যখন ব'সে মজলিস করতেন—অনেক সময় বলতেন, "অভয় মায়ের চাঁছিপুঁছি।" সকলের সামনেই বলতেন। আমার এ কথাটা খুব ভাল লাগত তা নয়, তবু বলতেন।

পরিচ্ছেদ—৪

সেই কুম্ভের কথা। সেই দিকে ফিরে তাকাই। ১৯৩৭ সালের কুম্ভ। ১৯৩৭ এবং ৩৮। গুরুপ্রিয়া দেবী আমাকে খুব ভালই বাসতেন। যে সময়ে গিয়েছি, সেই সময়ে গুরুপ্রিয়া দেবী অর্থাৎ দিদি মায়ের সেবাতে তৎপর হয়ে ঢাকা থেকে না কোথা থেকে যেন চ'লে এসেছেন মায়ের কাছে। তাঁর একটিমাত্র কাজ মায়ের সেবা। অন্য কোনো কাজ তাঁর নেই।

আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে দেখেছি একখানা বড় বোর্ডে দিদির সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর সব কথা লিখে রাখা হয়েছে। দিদির যে-রকম চরিত্রের আদর্শ তাতে তাঁর প্রসঙ্গ ওইভাবে লিখে রাখা একান্ত সমীচীন। কাশীতে কন্যাপীঠে এইরকম লেখা আছে। সম্ভবতঃ দিদির প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এইরকম স্মারক সব লিপি থাকাই প্রয়োজনীয়।

গুরুপ্রিয়া দেবীর প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা মনে পড়ে আমার। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে গুরুপ্রিয়া দেবী অর্থাৎ আমাদের দিদি একান্তভাবে অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে মায়ের কাজ ক'রে যেতেন। তাঁর নিষ্ঠার কথাই আমি বারে বারে ভাবছি।

আরও কথা আছে। কত কথাই না রয়েছে। কুম্ভের বাড়ীতে দিদি আমাকে একটি ভার দিলেন। আমার মনের মতই সে ভার। আমরা তখন রয়েছি পীতকুঠি নামক বাড়ীতে। হরিদ্বারের কথা বলছি।

গঙ্গার ধার। বাড়ীর একেবারে লাগোয়া গঙ্গা। যেখানে গঙ্গা বাড়ীর একেবারে পাশ দিয়ে গিয়েছে সেইখানে গঙ্গার কিনারটা সুন্দররূপে বাঁধানো। হঠাৎ যেন মনে হয় বাড়ীর ভিতর দিয়েই আশ্চর্য আমাদের গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা। সেই গঙ্গার তীরখানি চমৎকার বাঁধানো। বাড়ীর ভিতরে ব'সেই যেন মা গঙ্গার স্পর্শ পাচ্ছি।

সেই বাড়ীতেই কিছুকাল ছিলেন আমাদের আনন্দময়ী মা। মা তখন খুব অসুস্থ, আমি তখন নতুন এসেছি। ভোলানাথ অর্থাৎ মায়ের স্বামী তখন মায়ের কাছে।

মায়ের কাছে দেখতাম একটা হিসাব ছিল। বেহিসাবী হিসাব। কত কে আসছে যাচ্ছে অথবা মায়ের কাছেই থাকছে তার কোন হদিস আমি পেতাম না।

পরবর্তীকালেও তাই। ইদানীং কালের কথা বলতে পারি না। মায়ের দেহাবসানের পরে হয়তো অনেক কিছু হয়েছে বা হয়ে থাকে। সে সকল বিষয় নিয়ে আমি বেশি ভাবিও না, আমার সে-সব ভাববার কথাও নয়।

হরিদ্বারের কথা হচ্ছিল। হরিদ্বারে গঙ্গার লাগোয়া একটি বাড়ীতে—অর্থাৎ পীতকুঠিতে আমরা তখন বাস করি। কুম্ভের স্নানের অতি অল্প বাকি। মায়ের শরীর খারাপ। খারাপ মানে খুবই খারাপ। দিনকে দিন খারাপ তখন। একরকমের জ্বর হচ্ছে মায়ের। এই জ্বরের কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

আমি আছি আমার ভাবের জগতে। মায়ের অসুখের গুরুত্ব বুঝতাম। তবু তেমন ভাবে মাথা ঘামানো আমার দ্বারা হয়ে উঠত না। আজ স্বীকার করছি, কোনো বিষয়েই উচিত মতো মাথা ঘামানো আমি যেন পেরে উঠতুম না। অথবা পেরে উঠি না। যেন আমি থাকতাম আমারই তালে—আমারই ভাবে—আমারই ছন্দে।

যখনকার কথা বলছি তখন বয়সের দিক থেকে teen আমি ছাড়িয়ে যাইনি। সেই কারণেও বটে, অন্য কারণেও বটে, আমার স্বভাবটাই ওইরকমের—তার জন্যেও বটে। আমি আমার তলাতেই থাকতুম। তিনতলা, পাঁচতলা, সাততলা—এই সব কত তলাতেই মানুষ থাকে দেখতে পাই। আমি ওইসব কোনো তলাতেই থাকতুম না। আমি থাকতুম আমার তলাতেই। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আমি থাকতুম আমার ভাবের জগতে। কথাটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, আমি আর কারোর দ্বারা বড় বেশী প্রভাবিত হ'তাম না। যে প্রভাবে প্রভাবিত হ'তাম সেই প্রভাবটা আমারই প্রভাব, আমার নিজেরই এক রকমের ভাব অথবা ছন্দ। সেইখানেই আমি প্রধানত বাস করতে ছেলেবেলার থেকেই অভ্যস্ত। অর্থাৎ কিনা আমি আমার কাছেই থাকি। আমি অন্যত্র থাকি না। এমন লোক অনেক দেখতে পাই যারা পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে অন্যত্র বাস করতে অভ্যস্ত। নিজের কাছে নয়। এইরকমটা খুব ঘটে চারিদিকে।

হরিদ্বারের কথা হচ্ছিল। ঘুরেফিরে ডাক্তার পন্থের সেই পীতকুঠি। যতদূর মনে পড়ে পীতকুঠি বাড়ীটা ডাক্তার পন্থেরই বাড়ী। সেই বাড়ীতেই আমরা সব রয়েছি। আর আমাদের সকলকে নিয়ে সর্বোপরি মা স্বয়ং রয়েছেন।

আমি তখন ছেলেমানুষ। কতটা ছেলেমানুষ ছিলুম জানি না, কিন্তু দেখতে পেতুম অনেকেই আমাকে ছেলেমানুষ ব'লে গণ্য করত। মা তাঁর হিসেবে—তাঁর ভাবে আমাকে মনে করতেন নিতান্ত একটি ছেলেমানুষ ব'লে। এরকম ভাবে চলে আমাদের দিন।

এমন সময় বাবা ভোলানাথ আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন। অনেক দিনের কথা। ভোলানাথ কোথায় যেন গিয়েছিলেন। হয়তো বা ঢাকার দিকে। মায়ের অসুখের কথা শুনে তিনি যেন ব্যাকুলপারা হয়ে এসে পড়লেন।

যেদিনকার কথা বলছি সেদিনকে কথায় কথায় মায়ের সঙ্গে বাবা ভোলানাথের লেগে গেল এক তুমুল তর্ক। সে গল্পটাই করব এখানে। আমার তো ছিল হাসির ব্যারাম। এমন হাসি যে ব্যারাম না ব'লে পারা যায় না। আমি আমার এই পুস্তকে পূর্বে উল্লেখ করেছি আমার এই হাসির কথা। হাসি একবার শুরু হ'লে সহজে থামত না। সেই হাসি পাঁচ সাত মিনিট তো চলতই, এক এক সময় আরো বেশী। আমি হাসতুম আর হাসতুম। যখন মায়ের কাছে যাইনি—যখন আমি বাড়িতে তখনো যে এক আধবার এইরকম হাসি হয়নি তেমন নয়। তবে তখন বলা চলে গোড়ার দিক। সেই হাসি গড়াতে গড়াতে এতদূর এগিয়ে যে পৌঁছবে সে কথা তখন কে জানতো।

আমি শুনেছি আমার ঠাকুরদার পিতা মাঝে মাঝে ওইরকম হাসতেন। সেই বংশেই তো জন্ম আমার। সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু না ব'লে পারছি না, আমার প্রপিতামহ সেই যুগের একজন বিরাট বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। নাম তাঁর দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার। যদিও পূর্ববঙ্গের মানুষ তবু তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েছিলেন নবদ্বীপ এসে। তর্কশাস্ত্রে অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি সুবিশাল মহীরুহের মতো। আবার তাঁর ভ্রাতা হরিদাস সার্বভৌম—তিনিও তথৈবচ। এই দুইজনেরই পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। দুই ভাই যেন দুইটি দিকপাল।

আবার এও শুনেছি, আমার প্রপিতামহ ছিলেন আশুকবি—মুখে বানিয়ে বানিয়ে কবিতা রচনা করতে পারতেন। করতেনও।

আমার প্রপিতামহের সংবাদ যতটা পারি দিয়ে যাই যতটুকু মনে আছে অর্থাৎ কি না মনে পড়ে।

আমি হাসতে লাগলে থাকতে পারতাম না। হাসছি তো হাসছিই। আমার এই হাসি দেখেই তো হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় একজন সাধুবাবা আমাকে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষ একটা প্রকাশ আছে। সেই প্রকাশেরই বহিঃপ্রকাশ এই বিচিত্র হাসি।

আবার ফিরে যাই। স্থান হরিদ্বার। ডাক্তার পন্থের পীতকুঠি নামক বাড়ি। মাতা আনন্দময়ীর শরীর বিশেষ অসুস্থ। তাঁর অঙ্গে রোগবালাই আমরা প্রায় কোনোদিনই তেমন একটা দেখিনি। একেবারে পরবর্তীযুগে—ইদানীংকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। হয়তো বা দুর্বলতাবশতঃ অথবা বার্দ্ধক্যের ফলশ্রুতি এই অসুখ। এবারে আবার যাই সেই হরিদ্বারের কথাতে।

একটা কথা না ব'লে পারছি না, এবং এইখানেই বলব মনে করছি। আমাদের মায়ের জীবনটাই যেন একটি আস্ত মহাভারত। প্রসঙ্গক্রমে আমি আমার সেই মাতা আনন্দময়ীর জীবনীভাগে এসে পড়েছি। আমি লিখছি কিন্তু আমার কথা, আমার জীবন-কথা, তাও কিছুটা। এখানে ঘটনাক্রমে এসে পড়েছে আমাদের শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর প্রসঙ্গ। তাঁর প্রসঙ্গই তো আমার জীবনের অনেকখানি। সবখানি না হ'লেও অনেকখানি। তাঁর কথাই চলেছে।

হরিদ্বারে পীতকুঠিতে মা অসুস্থ। আছেন ডাক্তার পন্থের বাড়িতে ডাক্তার পন্থেরই হেফাজতে। আমি কিছুকাল হ'ল মায়ের কাছে এসে পড়েছি। মায়ের কাছেই আছি। মায়ের কাছেই আমার দিন কাটে। উপস্থিত মায়ের কাছে আছি। আমার উপরে ভার দিয়েছেন দিদি অর্থাৎ গুরুপ্রিয়া দেবী, মায়ের তদারকির ভার। চুপচাপ ব'সে মায়ের শরীরের প্রতি খেয়াল করা এবং খেয়াল রাখা। দুপুরবেলা ঘণ্টা চারেক বিশেষ

ভাবে আমার কাজ। মায়ের খাওয়া হয়ে গেলেই দিদির কথা মত আমি ব'সে থাকি মায়ের কাছখানটিতে। ঘরে আর কেউ নেই। দেখা বল, শোনা বল ওই সময়টিতে আমাকেই করতে হয় যা কিছু। আমি প্রায়ই ওই সময়ে ব'সে কাটিয়েছি ঘণ্টা চারেক মায়ের কাছে।

মায়ের বেশ বড় রকমের অসুখ চলেছে। কিন্তু আমি আমার স্বভাব ত্যাগ করতে পারি না। অন্যান্য দিক বাদ দিলেও আমার সঙ্গে থাকে আমার সেই হাসির রোগটা। আমি হাসি। আমি হাসতে থাকি। যখন হাসি ওঠে তখন আর আমায় থামায় কে। হাসতে হাসতে আমি হয়ে যাই জেরবার। মা আমাকে অত্যধিক স্নেহ করেন তাই বোধ হয় রক্ষে। তা না হ'লে আমাকে অনেকখানি বেশী ঝামেলা পোহাতে হ'ত— এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমি তখন আমার ভাবেই আছি বটে কিন্তু মায়ের স্নেহ যে আমাকে ঘিরে রেখেছে এবং ধ'রে রেখেছে সেই বিষয়টা অত্যন্ত জীবন্ত এবং স্পষ্ট।

ভোলানাথবাবা এসেছেন। তিনি মায়ের একনিষ্ঠ স্বজন এবং ঐকান্তিক ভক্ত। এ বিষয়ে কোনো কথাই নেই।

একদিন মায়েতে আর বাবাতে লেগে গেল তুমুল তর্ক। বিষয়টা আর কিছু নয়, আমার হাস্য। আমার সেই উদ্বেল হাসি—যা বেলাভূমি অতিক্রম ক'রে কোথায় যেন চ'লে যায়—ভোলানাথ বাবার অতিরকম আপত্তি।

এ একটা কথা হল? এ কি রকম আবদার, সবটাতেই হাসি? শান্তশিষ্ট, নিয়মনিষ্ঠ জীবনটাই তো সুন্দর জীবন। না। এরকম হাসি ঠিক নয়। এরকম হাসিকে চলতে দেওয়া উচিত নয় ব'লে মনে করি। বিশেষতঃ মায়ের তো বিষম অসুখ।

ভোলনাথও তাঁর নিজের হিসেবে মাকে মা ব'লেই ডাকতেন এবং মনে করতেন। ভোলানাথ ছিলেন ঘোর শাক্ত। আমি যদিচ আমার তাল থেকে এক ইঞ্চিও স'রে বসতুম না অথবা নড়াচড়া করতুম না তবু কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ করতুম। এবং ভাবতুমও বটে।

তখন ঠিকমত বুঝতে পেরেছি কি না জানি না মা ছিলেন তাঁর এই নগণ্য ছেলেটার দারুণ সমর্থক। আমি হাসতে আরম্ভ করলেই ভোলানাথ যতটা রাগতেন মা ততটাই আমার পক্ষ নিতেন এবং আমাকে সমর্থন করতেন। একদিন এই ব্যাপারটাই চরমে উঠল। একদম শিখরে।

কথায় কথায় আমার হাসি এসে গেল। আমি হাসছি তো হাসছিই। ভোলানাথ বাবা ততই রাগছেন। এ কি অন্যায় কথা! এ কি রকম পাগলামি! এই ছেলেটা তো মহা পাজি ছেলে দেখছি।

আমার কিন্তু ভোলানাথ বাবাকে খুব ভাল লাগে। পরবর্তীকালে এমন সময় এসেছে যখন আমি মায়ের থেকেও ভোলানাথ বাবাকে বেশী পছন্দ করি। তেমন বড় কোনো সাহিত্যিক থাকলে একটা সুন্দর ছবি ভাষা দিয়ে আঁকতে পারতেন।

যেদিনকার কথা বলছি সেদিন ঘটনা এইরকম দাঁড়াল। ভোলানাথের সঙ্গে কথায় কথায়—তর্কে বিতর্কে মা কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একেবারে ঠাণ্ডা মেরে চুপটি ক'রে প'ড়ে আছেন।

বাস্ আর কথা নেই। একটা বিরাট ওষুধ পড়েছে। মা একে অসুস্থ। তার উপরে প্রবল স্রোত অথবা প্রবল ঝড়। মায়ের শরীর একেবারে ব্যবহার জগতের সীমা অতিক্রম ক'রে অপর এক জগতের দ্বারদেশে এসে যেন পৌঁছে যায়।

এ কি দেখছি। ভোলানাথ বাবা তাঁর জটা মায়ের পায়ে ঘসছেন। মাকে তিনি প্রসন্ন করতে চান। তাঁর সবকিছুই তিনি মায়ের পায়ের কাছে বুঝি ভাসিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে দেবীর উপাসক। জগন্মাতা মহাদেবী তাঁর যে উপাস্য দেবতা। তাই তিনি মায়ের একটুখানি হাসি মুখের জন্য এত ব্যাকুল—এত লালায়িত।

ক্রমে ঘটনা চুকে যায়। সমস্ত ব্যাপার মিটে যায়। দিবসের পরে দিবস চ'লে যায়। মা এ জায়গা, ও জায়গা, সে জায়গা হয়ে ক্রমে এসে পড়েন রায়পুরে। পরে আরও কত ঘটনা। ঘটনার পরে ঘটনা।

আমি এসেছি কিছুকাল মায়ের কাছে। ভাইজীকে আমি পাইনি।

একবার ভাইজীকে দেখেছিলুম হয়তো কলকাতায়। তারাপীঠেও আমি ভাইজীকে দেখতে পেয়েছিলুম হয়তো।

তারপরে সব মিটে গেল। ভাইজী যেখানকার মানুষ সেখানে চ'লে গেছেন। ভাইজীর দেহত্যাগের পর মা না কি ২০/২৫ দিন পাথরের মত শুয়ে ছিলেন। কান্নাকাটা নেই। দুঃখ ব্যথার অপর কোনো প্রকাশ নেই। বিয়োগ বেদনা প্রকাশ করবার কোনো প্রকার বাইরের ব্যাকুলতা নেই। কেবল শুয়ে থাকতেন। বোধহয় একটা ব্যথার সাগরে ডুব দিয়েছেন। তাই কেবল প'ড়ে থাকতেন আপন ভাবের গভীরতার অতল তলাতে। আমরা হয়তো ঠিকমত বুঝতে পারব না মায়ের সুগভীর ভাবের কথাটা। তখন মায়ের মধ্যে কি ভাইজীর স্মৃতির প্রবাহিণী নিত্য বইত? কি হ'ত, কেমন হ'ত কে জানে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর মা উঠে দাঁড়ালেন। যেমন ছিলেন তেমনি। তারপর আরম্ভ হ'ল আবার বিচরণ। সেই সময়টাতে আমি গিয়ে পড়লাম মায়ের ইতিহাসের মধ্যে। আরম্ভ হ'ল মায়ের সঙ্গে আমার ইতিহাস। মায়ের সঙ্গে ছেলের একটি আশ্চর্য ইতিহাস। অনেকদিন—অনেক অনেক দিন। তারপরে যখন মায়ের দেহত্যাগ হ'ল তখন আমি দূরে, সুদূরে।

দূরে সুদূরে হ'লেও তখন আমি আছি আমার মায়ের কাছেই। আমার যে মা তার যে বিশ্বের মধ্যে অপরূপ পরিচয়। সে শুধু মা। আমি তার হাতেই তৈরি। তার কাছেই বাস করি। আবার তার কাছেই যাওয়ার জন্য আমার জয়যাত্রা।

মায়ের কাছেই আমার সকল খেলা চলেছে। মায়ের কাছে—একথা না ব'লে তুমি বলতে পার হরির কাছে অথবা দুর্গার কাছে। অথবা তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পার শ্রীগুরুর কাছে। যখন তিনি উদ্ধার করেন তখনই তাঁর নাম—গুরু।

অন্ধকার থেকে আলো দেন—তাই তিনি গুরু। ক্ষুদ্রতার থেকে বৃহতে তিনি পৌঁছে দেন—সেই কারণেই তিনি গুরু। তিনি ফিরে চাইলে নিমেষে সকল বাধা দূর হয়ে যায়। শুধু তাঁর ফিরে চাওয়ার অপেক্ষা। আমি

আর কিছু পারি আর না-পারি সেই তাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রে বলতে যেন পারি—বারে বারেই বলতে যেন পারি, 'ওগো তুমি ফিরে চাও। তুমি ফিরে না-চাইলে তো কিছু হয় না, হ'তেই পারে না। তাই আমি তোমাকে বলছি—শুধু তুমি ফিরে চাও। তোমার ফিরে চাওয়াতে সকল বাধা বন্ধ দূর হয়ে যাবে। তুমি ফিরে চাইলে যা ঘটে না, যা হয় না সে সমস্তই রূপ নেবে। ভুল, ত্রুটি, অন্ধকার থাকলে সে-সবও নিমেষে স'রে যাবে। আমার যে স্বরূপ সেই স্বরূপটাই রূপ নেবে। তাই তোমার দিকে বলি, তুমি আমার দিকে ফিরে চাও। শুধু তুমি তোমার স্নেহ-দিঠি নিয়ে আমার দিকে তাকাও। তাতেই যা কিছু হবে। তুমি বললেই হবে। তুমি চাইলেই হবে। তোমার ইচ্ছাই যে সব কিছু, এই কথার উপরে আর তো কোনো কথা নেই।'

পরিচ্ছেদ—৫

বাবা ভোলানাথের সেই কাহিনী চলছিল। ভোলানাথ আমার হাসি নিয়ে মায়ের সঙ্গে অনেক কিছু তর্ক করলেন। তর্ক করার পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। মা চুপ হয়ে গেলেন। তাই তার ফলে বাবা ভোলানাথও কাজে কাজেই চুপ হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা এইভাবে তখনকার মতো থেমে গেল।

এইখানে আমার একটা কথা মনে প'ড়ে যায়। আমরা যে-সময়ে হরিদ্বারে গিয়ে পৌঁছুলুম সেই সময়ে হরিদ্বারে নান্‌কী মায়ীর ধর্মশালায় থাকতেন আমাদের দুই ব্যক্তি। একজন মায়ের কিরকম বোন—আমাদের মাসীমা—আমাদের সুশীলা মাসীমা। দেখাশুনো করবার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদের নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়। নিশিবাবু সেই যুগে মায়ের এক পরম ভক্ত। নিশিকান্ত মিত্র। তিনি থাকতেন আর থাকতেন আমাদের সুশীলা মাসীমা।

আমরা যেদিন গিয়ে হরিদ্বারে পৌঁছুলুম—সে এক কাণ্ড। নান্‌কী

মায়ীর ধর্মশালাতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলুম ওঁরা সবাই ভোরের বেলায় কোথায় যেন বেরিয়েছেন। ধর্মশালাতে ওঁরা কেউ নেই তখন।

সে সময়ে কুম্ভের বাজার। চারিদিকে সোরগোল প'ড়ে গেছে। কিছুকাল বাদেই কুম্ভ। মানে কুম্ভস্নান। অন্যের পক্ষে অন্যরকম। কিন্তু আমাদের পক্ষে কুম্ভস্নানের উদ্‌যোগ পর্ব। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে সে সব ব্যাপার খুব বড় একটা ব্যাপার নয়। এখন আমি মনের মধ্যে খুঁজে দেখতে পাই, কই কিছুই তো চিহ্ন সেখানে অবশিষ্ট নেই। হয়তো কিছু চিহ্ন প'ড়েছিল। সেই সমস্তও কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। আমার জীবনের ক্ষেত্রে সে-সবের আর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না কিছু।

আবার হরিদ্বারের কথায় আসি। এবারে আসছে আমাদের সেই তখনকার জীবনের ক্ষেত্রে স্বামী অসীমানন্দের কথা। তাঁর কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে যেন একটু বিশেষ কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। কথাটা কিন্তু একটু অন্যরকম। লোকে যাকে ভাল বলে সেই রকম ভাল কথা নয়। ভাল না হ'লেও অত্যন্ত রকমের সত্য কথা। কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের কাহিনীকে যেরকম ভাবেই দাঁড় করাই না কেন অসীমানন্দের সেই একটা ব্যক্তিত্ব কি রকম যেন একটা নোংরা ভাবেই আমাদের কাহিনীকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং অধিকার ক'রে ফেলেছিল।

মনে রাখতে হবে সেই যুগটা আমার জীবনের এই যুগ নয়। তখন আমার বয়স পনের ষোলোর মতো। তখনো আমি teen ছাড়িয়ে যাইনি। বয়সেও যেমন কাঁচা মনের দিক থেকেও তেমনই। অন্য কথা বাদ দিলেও আমি তখন নিতান্ত নাবালক ছাড়া কিছুই নই।

আমি কিন্তু মনে ভাবতুম এবারে হয়তো আমি একটা কেউকেটা হবার পথে চলেছি। আবার মনে মনে এও ভাবতুম, আমি একটা কেউকেটাই আছি। কেউ যদি আমাকে স্বীকার নাও করে তবুও আমি কেউকেটা ছাড়া কিছুই নই। এইখানে আমি ব'লেই যাব, চিরটাকাল আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে এক রকম একটা আত্মসম্মান বোধ। আমি যেন সদাই জানি আমি অসাধারণ এক ব্যক্তি। যে আমার জন্য যা করছে সবই যেন আমার

পাওনা। করবেই তো। আমি যে একটা উত্তুঙ্গ শিখরে বসবাস করি। সেইখানকার একজন মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কার হেন সাধ্য।

হরিদ্বারে দিনের পরে দিন কাটতে লাগল। বাবার কাছ থেকে আমি এসে পড়েছি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর এলাকার মধ্যে। আমার জীবনে তখন একদিকে আমার শৈশবের প্রভাব আর একদিকে নতুন জগতের নতুন একটা শক্তি, আলো এবং অভিব্যক্তি। যা কিছু ঘটছে, যে আমাকে যা কিছু দিচ্ছে—সমস্তই যেন আমার পাওনা। সবাই যেন আমাকে চারদিক থেকে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতেই ব্যস্ত। এইরকম ভাবে চলল আমার জীবনের রথ পথ অতিক্রম ক'রে ক'রে। সমস্ত জিনিসই যেন আগের থেকে তৈরিই ছিল। সমস্ত—সমস্ত।

যেটা যেটা হয়ে গেছে সেইগুলোই আবার ক'রে হচ্ছে। নতুন যেন কিছুই নেই। শুধু আমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই—আমিই এইখানে নতুন নায়ক অথবা নতুন মানুষ। নতুন নতুন হয়ে ওঠাই আমার স্বভাব।

আমাকে দিয়ে আরম্ভ। তাই আমাকে দিয়েই কথাটা তুলেছি। আমার থেকে শুরু ক'রে যা কিছু সব—একেবারে সমস্তই নতুনের কোঠায় গিয়ে পড়ে। প্রত্যেকটা মুহূর্তেই ঠাহর করলে দেখতে পাওয়া যায়, কিছুই আর পুরনো নেই। কই, কিছুই তো পুরোনো দুনিয়াতে রইল না। সমস্তই ক্ষণে ক্ষণে নতুন হয়ে উঠেছে এবং উঠছে। যার দেখবার চোখ আছে সে দেখুক না, শোনবার কান থাকলে সে শুনুক। যে কোনো ইন্দ্রিয়ের দিক থেকেই বলছি। বোঝবার ক্ষমতা থাকলে বুঝে নাও। যা কিছু বুঝে নাও। বেশ ক'রে সব কথা বুঝে নাও দিকি।

এক কাজ কর, এখন এ ভাবে বুঝতে বুঝতেই চল। বুঝতে বুঝতেই চলতে থাক। তারপরে গিয়ে তুমি যথাস্থানে পৌছবে। তখন দেখতে পাবে, একেবারে সমস্তই ঠিক। ঠিকই আছে সব। কিছুমাত্র কিছু বেঠিক নেই। গোলমালের দিকটা একেবারে কোথাও কিছু নেই।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুসারে আমরা তখন কাজ ক'রে যাচ্ছি। সেইভাবেই

চলেছে। তবে একটা কথা বলি। আমরা তখন morality র মানদণ্ড শক্ত ক'রে ধ'রে আছি। কোনোদিক দিয়েই যেন একটু ব্যতিক্রম না ঘটে। আমরা চলেছি এগিয়ে। আগে আরো আগে। গভীরে আরো গভীরে। তলাতে তলাতে আমরা যেন তলিয়ে যাচ্ছি।

একটা যেন নেশাতে চলেছি। সমস্তই নেশা। কোন্ সে গভীরে, কোন্ সে সুদূরে, কোন্ সে অতল তলাতে তলিয়ে চলেছি। কোথায় গিয়ে পৌঁছব সে কথা আমার জানা নেই। একটা কিছু ঠিক ক'রে নিয়েছি। সঙ্গে কিন্তু রয়েছে একটা আনন্দের প্রবাহিণী। অদ্ভুত আনন্দের আশ্চর্য প্রবাহিণী।

কিন্তু এসব কথাও শেষ কথা নয়। একেবারেই শেষ কথা নয়। তার-পরেও অনেকখানি আছে। মনে হচ্ছে অনেকখানি এসেছি। কিন্তু সেখানেও সম্মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওই যে, দূরে সুদূরে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, জীবনটাও তাই বিস্তারিত। ওই, ওই, ওই। আমি এগিয়ে চ'লে যাই। আমার সঙ্গে কিছু লোক রয়েছে যে। তাই বলি, আমরা এগিয়েই চ'লে যাই। থামবার কোনো দরকার নেই। সমুখপানে কোথায় যেন আমাদের গন্তব্যস্থান। সেই দিকেই যেতে হবে।

পরিচ্ছেদ—৬

আমরা তখন দিল্লীতে। রাজা বাজারের সেই একটি বাড়ীতে। এখানকার এখনকার শ্রীমতী চিত্রাদের সেই বাড়ী। গভর্নমেণ্টের ছোট্ট-খাট্ট একটি কোয়ার্টার। সুন্দর এই বাড়ী, এই কথা মন খুলে এবং প্রাণ খুলে বলতে পারি। একদিকে একটি ছোট ঘর আমাকে দিয়েছিল থাকতে। ভাড়ার কোনো কথাই নেই। আমি এবং আমার সহধর্মিণী যমুনা ওই ঘরখানিতে ওদেরই একজন হয়ে আনন্দে বসবাস করি।

আমার কাজ প্রধানত গান শেখানো। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনা নিয়ে আছি। আর একটা আছে আমার স্বভাবধর্ম। সেটা আর কিছু

নয়, সেটা লেখাপড়া। সেটা পড়াশুনো। গানবাজনা করি আর পড়াশুনো নিয়ে থাকি। ধর আমার সামনে এসে পড়ল একটা লীলাকীর্তন। মনে কর, রাস গাইতে হবে। রাস গাইবার মালমশলা যতটুকু যা পারব ঠিক ক'রে নিলুম। বাস্। তারপরে রাস নিয়ে আমি একেবারে ডুব দিলুম রাসের রসসাগরে।

একটা কথা বলি, যতই না কেন আমরা ফুলিয়ে এবং ফাঁপিয়ে কথাটাকে বেলুনপারা ক'রে তুলি খুব বেশী বাড়ে না কথাটা। Upto certain limit একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকে যায়। ঠেকে, ঠুকে এবং ঠ'কে শেষকালেতে হয়তো ঠিকেতে গিয়ে দাঁড়ায়। তাও বলছি—হয়তো। কোথায় কে জানে। কোথায় নিয়ে গিয়ে যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে কেমন ক'রে দিব্যি গালব। কোনো বিষয়েই দিব্যি গালা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভবের কোঠায়। অনেক সময়ে সন্দেহ হয়, বিলকুল নাকচ ক'রে দেব কি না।

সে যা হোক, চলল, গাড়ি চলল। এরকম ভাবেই আমাদের যাত্রা। তবে সেটা জয়যাত্রা কি না তা বলতে পারি না। জয়যাত্রা কি পরাজয়যাত্রা সেটা আমার বলবার সাধ্য নেই।

এই তালে কিছু দার্শনিকতার কথা ফাঁদি। প্রসঙ্গটা যখন এসেই পড়েছে তখন একহাত নিতে আপত্তি কি। বুদ্ধিমান মানেই দার্শনিক। চক্ষুষ্মান মানেই দ্রষ্টা। যে-কটা ইন্দ্রিয় আছে সেইকটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা কিছু না কিছু তথ্য বুঝতে পারি। তথ্য সংগ্রহ করি ব'লে আমাদের বোঝা বাড়ছে, অভিজ্ঞতার ঝাঁপি ভারি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের অন্তরের বুঝ বাড়ছে কি। Ultimately আমরা লাভ করছি কি না। বুঝতে পারার ধনে ধনী হয়ে, জানতে পারার আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা আমাদের জয়পতাকা আকাশের তুঙ্গদেশে তুলে আনন্দে আনন্দিত হ্যাঁ কি না। এইখানেই এসে ঠেকলাম শেষকালে। আনন্দময়ী আশ্রমের যোগেশদা বলতেন, মারা যায় বাউন করা যায় কি। আমিও সেই কথার ধুয়ো ধ'রে সেই কথাটাকেই এখানে উজ্জ্বল ক'রে রাখছি। শেষ পর্যন্ত

কোথায় গিয়ে যে পৌঁছব—সে কথা এখানে বলতেও পারছি না এবং জানতেও পারছি না —মোটেই না।

আমি একটা সময়ে লীলার পরে লীলা গাইতুম। অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। আজ শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলা, কাল আবার আর একটি। আর একদিন হয়তো কৃষ্ণের আর একটি লীলা। কৃষ্ণের লীলা ছাড়া কী আমি অন্য লীলা গাইনি? হ্যাঁ তাও গেয়েছি। যে কোনো কাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই আমি গান গাইতাম। যা কিছু গান গাইতাম—প্রসঙ্গ একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রসঙ্গ। অন্য প্রসঙ্গ বড় একটা গাইতাম না।

আবার গানের বেলাতেও তাই। গান যা গাইতাম সমস্তই ঈশ্বরের সম্পর্কে। আমার যেন অন্য কোনো গান আসতই না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই গান অর্থাৎ ঈশ্বরের গান—কেবলমাত্র ঈশ্বরের সম্পর্কিত গান। এই ভাবে গানের পরে গান চলত। এক একটা কালে এক একটা ধরন।

গান মুখস্থও ছিল প্রচুর। আমার অজ্ঞাতসারেই গানের পরে গান—বড় বড় লেখকের গান আমার মনের মধ্যে গাঁথা থাকতো। হয়তো দু এক সময়ে গানের 'কথা' ভুলে গেছি। বেশীর ভাগ কালেই মনে থাকত।

তারপরে যুগের পরিবর্তন হ'ল। গানের পরে গানের কথা-সম্ভার আমার কাছে তেমন ক'রে আর সাড়া দিত না। তার বদলে এসে পড়ত নতুন নতুন কথা নিয়ে নতুন নতুন বিন্যাস। এইভাবে কোনো একটা সময়ে আমি কেবল নতুন কথার যোগান দিতাম। নতুন কথায় থাকতো নতুন ভাব—এমন কি নতুন ভাবনা। ভাবের পরে ভাব, ভাবনার পরে ভাবনা। সমস্তই নতুন। নতুনের পর নতুন।

কথাটা এই, আমাদের জগৎখানার বিন্যাসের কথাই বলছি। যেমন আছে তেমনই আছে। কিন্তু সব সময়ে সে নতুন নতুন হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। আগেও তাই, এখনও তাই, চিরকালই তাই। এত ঘটনা ঘটল—এত কাণ্ড সংঘটিত হ'ল কিন্তু চিরন্তনের সেই নতুনত্ব ফুরিয়ে গেল না। যাবেও না। চিরকাল এই রকম থাকবে। তবে যদি কোনোসময়ে যেতে যেতে আমি এই দেশকালের পারম্পর্যের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারি তখন অন্যরকম।

সেই জিনিসটা হয়নি কিন্তু। আজ অবধি হয়নি। এই জগতে অনেক কিছুই হয়েছে কিন্তু ওইরকমটা হয়নি। আর সব রকম বোধ করি হয়ে গেছে। ওই একটা রকম বাকি আছে। আবার ওই একটা রকমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক রকম—সহস্র রকম।

আমার সেইখানেই তো দুঃখ। অথবা আমার সেইখানেই failure. করতে আমি পারলাম না। করবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। হয়ে উঠবে কি না সে-কথাও তেমন ক'রে জোর দিয়ে বলতে পারছি না।

সত্যি কথা বলতে কি আমার আর কিছু করবার ইচ্ছে নেই। এককালে অনেক ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে যেমন ছিল তেমনই আমি করেছি। যেমন যেমন ছিল তেমন তেমন সম্পাদন করতে কসুর করিনি। এ কিছুই আমার শক্তিতে নয় অথবা নয় আমার সামর্থ্যে। আর একজন দিয়েছে আমি ক'রে গিয়েছি। আর একজনের দাগের উপর আমি দাগা বুলিয়েছি মাত্র। তবু আমার পক্ষ থেকে বলি, কিছুই আমি করতে পারিনি। তুলনায় একেবারে কিছুই না।

যেমন ভেবেছিলুম তেমন হয় নি। যাহা ভাবিয়াছি তেমন হয় নাই। তেমনটা—ঠিক তেমনটা কিছুই সাধিতে পারি নাই। ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু করা হয় নাই। এমনটা কে করিল। আমার ইচ্ছা চলিল না। তবে কার ইচ্ছা চলিল। সে-কথা আমি বলিতে পারি না।

ঠিক বলিতে না পারিলেও আমি যেন জানি আর একজন আসিয়া গোলমাল পাকাইয়াছে। বেশ। তাহাই হইল। কিন্তু ভাবি সেই লোকটা কে। এমন ধারা কাহার ধারা। শুধু চাহিয়া দেখি আর দেখি।

পরিচ্ছেদ—৭

হাঁ, আমার জীবন-কথার মধ্য দিয়ে চলছিলাম। আমার জীবনের কাহিনী আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। ঘটনার পারম্পর্যের ঘূর্ণিপাকে

প'ড়ে একেবারে টালমাটাল হয়েছি। এবার ফিরতে চেষ্টা করি নিজের জায়গাটিতে। কি বলতে চেয়েছিলুম আর কি বলছি সেই দিকটা একবার ভেবে দেখা যাক।

লীলার পরে লীলাগান চলত আমাদের। মাঝে মাঝেই এসে পড়ত আমাদের লীলাকথা প্রসঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাই ছিল আমাদের প্রধানত উপজীব্য। আমাদের এই দুনিয়াতে অনেক লীলাই তো রয়েছে। অনেক রূপে অনেক লীলা। কে যেন একজন নানারকম রঙ ঢঙের মধ্য দিয়ে কাণ্ড ক'রে চলেছে। সবগুনোই লীলা তাঁর। এমন কি এই বিশ্বটাই সেই একজনের লীলামাত্র। আর কিছু তো নয়। এ কথা আমি আমার মতো ক'রে দেখতে পেয়েছি। আমার মতো ক'রেই উল্লেখ করছি।

সেই গল্পটা লিখেছি কি না জানি না। দিল্লীতে অর্থাৎ কি না নিউ দিল্লীতে রাজাবাজারে থাকাকালীন একদা মনে করলুম আমাকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অবলম্বন ক'রে গান করতে হবে। লীলাকীর্তন। অর্থাৎ কি না পালাকীর্তন। তোড়জোড় ক'রে অনেক ঘণ্টা খেটেখুটে পালাটাকে দাঁড় করালুম। মনে পড়ছে গোড়াতে একটি সংস্কৃত শ্লোকও দিলুম, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক। ভগবানপি তা রাত্রিঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা। বিক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়াম্‌ উপাস্রিতঃ॥ রাসলীলা প্রসঙ্গে বিখ্যাত শ্লোক এইটি। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি দিল্লীতে চিত্রাদের বাড়ীতে একেবারে হুমরি খেয়ে কাটিয়ে দিলুম পুরো একদিন কিংবা দেড়দিন। দু দিনও হ'তে পারে।

মনে রাখতে হবে, এটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাংলাদেশও নয়। একেবারে নিউ দিল্লী। সেকালে নিউ দিল্লীতে একটা বড় রকমের দল ছিল। সেই দলে ছিল বেশ অনেকগুলো ছেলে এবং মেয়ে। সবশুদ্ধ পনের বিশটা তো হবেই। আবার তার মধ্যে দু চার জন ছিল হিন্দুস্থানী ছেলে। অন্তরের যোগাযোগ এক আশ্চর্য বস্তু। সেই যোগাযোগেই আমরা ছিলুম সকলে। বেশ অনেকগুলো ছেলে আমরা এবং মেয়েরাও। কী আশ্চর্য ছিল এই সম্মেলন। এতগুলো যুবক ছেলে এবং যুবতী মেয়ে একত্রিত হয়ে নাচ গান আনন্দ করত কিন্তু কোনোরকম অবান্তর দোষ

তাদের প্রায় স্পর্শ করত না—এটা কেমন ক'রে সম্ভব। অথচ ঘটনা তেমনই ঘটত। যতদূর আমার মনে পড়ে, যতদূর আমি জানি, যতদূর ব্যাপারটা—এই রকমই ছিল ঘটনা। এইরকমই ছিল মালাখানা। সেই মালাতে আমাদের সেই একজনের পূজা চলত। নিউ দিল্লীতে আমরা সবাই এই প্রকারে জীবনযাপন করতাম। এরই ফাঁকে গান শেখানোর টিউশনি ইত্যাদি সমস্তই চলত আনন্দে এবং স্বচ্ছন্দে।

এবারে আর এক কথায় আসছি। একবার শুনতে পেলুম, এক জায়গায় একটা বাড়ীতে একজন উলঙ্গ সাধু এসেছেন। কলকাতার মধ্যে সাধু—এ তো বড় একটা দেখা যায় না। সেও একেবারে উলঙ্গ সাধু। সে রকম তো চোখেই পড়ে না। কুম্ভের স্নানেতে অবশ্য একসঙ্গে হাজার হাজার উলঙ্গ সাধুর মিছিল আমি দেখেছি। সেই সময়ে এবং সেই স্থানে এই দৃশ্য চোখে বিসদৃশ মনে হোতো না। অবশ্য একটা দুটো ঘটনা আমাকে কিছুটা অবাক ক'রে দিত। দু বার অথবা বার তিনেক দেখেছিলুম আশ্চর্য দৃশ্য। এক সাধু ব'সে ব'সে রুল কাঠের মতো একটি কাঠে তার লিঙ্গটিকে জড়াচ্ছেন। জড়িয়ে জড়িয়ে বেশ কতগুলো প্যাঁচ দিলেন। বহুলোক ভিড় ক'রে দেখছে। আমিও দেখতে পেলাম। দৃশ্যটি অশ্লীল হ'লেও সবাই অবাক হয়ে দেখছে। লিঙ্গটি একটি গোল মতো কাঠের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। দেখছে দাঁড়িয়ে অন্তত শতখানেক লোক অথবা তার চেয়েও বেশী। কুম্ভস্নানে পথে ঘাটে উলঙ্গ সাধু। সেখানে এই দৃশ্য তত ভয়ঙ্কর নয়। আমাদের তাঁবুর পাশে একটি সাধু এসে একবার এই কাণ্ড ঘটালেন, এই দৃশ্য দেখালেন। স্থান এলাহাবাদ। গঙ্গার নিকটেই আছি আমরা। একবারের কথা তো আমার স্পষ্টই মনে আছে। সাধুটি ব'সে ব'সে আমার সামনে কেরোসিন তেল না কি যেন বেশ অনেকটা খেয়ে ফেললেন। তারপরে একটু ভূমিকা ক'রে একটুখানি কাপড় চাপা দিয়ে একটা শিশির মধ্যে বেশ খানিকটা প্রস্রাব করলেন। তারপরে দেশলাই জ্বালান মাত্র সেটা জ্বলতে লাগল। অন্তত শ' তিনেক লোক আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। কেউ ব'সে কেউ দাঁড়িয়ে।

কুম্ভ মেলাতে এই রকম সব ব্যাপার চারিদিকেই দেখা যায়। আমি মেয়েদের এই রকম একটা দলের কথা বইতে পড়েছিলুম। কিন্তু চোখে কোথাও দেখিনি। একটি বৃদ্ধা না কি সমাসীনা ছিলেন—সাধু এবং মাতাজী। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তাঁর স্তন দুটি এতই প্রলম্বিত ছিল যে, তাঁর যোনিদেশ সর্বদা আবৃত থাকত। এবং সেই স্থলে চারিদিকে থাকত নাগা সাধুর দল—সশস্ত্র এবং ভৈরবসদৃশ। আশপাশ থেকে কেউ সেখানে ঠাট্টা অথবা তামাশা করতে সাহসই পেত না। আমি পাঁচটি কুম্ভমেলা দেখেছি। কিন্তু আধুনিক যুগে এই রকম দৃশ্য আমার চোখে পড়ে নি। হয়তো গভর্নমেণ্ট আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বইতে যা পড়েছি সে পূর্ববর্তী কথা বই নয়।

আর একটি কথা না ব'লে পারছি না। এ সব কথা থেকে কেউ যেন মনে না করেন, এঁরা সবাই অতি উচ্চ মার্গের লোক, তা নাও হ'তে পারে। এমন সাধুও হ'তে পারে এবং কখনো কখনো দেখাও যায় যাঁর মাথার জটাতে টাকা লুকানো থাকে।

কামিনী এবং কাঞ্চন সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত পরিষ্কার জানাচ্ছি। কামিনীর থেকে কাঞ্চন আরো বেশী সাংঘাতিক। কামিনী এক রকমে জড়ায়, কাঞ্চন অন্য রকমে। দুটো প্রক্রিয়া এক রকমের নয়। দুটোর মধ্যে কাঞ্চনই অধিকতর সাংঘাতিক এবং ভয়াবহ। দুটোই মানুষের পক্ষে জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে কামিনীর থেকেও কাঞ্চন অধিকতর ভয়ানক।

দুটোই ভয়ানক। তবে কাঞ্চনের দাপট আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। সমস্ত দুনিয়াটাই কাঞ্চনের খেলাতে ঘুরছে। কামিনীর খেলাতে ততদূর নয়। দুটোই অত্যন্ত রকমের প্রয়োজনীয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার দুটোই অত্যন্ত রকমের সাংঘাতিক এতেও কোনো সন্দেহ নেই। দুটোই আশ্চর্য বস্তু। দুটোর মধ্যে একটি প্রেরণাই কাজ ক'রে যাচ্ছে। এই দুনিয়াদারি থাকাই চাই! অন্য রকম হ'লে চলবে না। এই উল্লাস

এবং উচ্ছ্বাস নিতান্তই থাকবে। যিনি চাইছেন তাঁরই একটা দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরো দিক আছে কিন্তু।

যে দিকটা আমরা দেখতে পাই সেই দিকটা জগন্মাতার জগৎ-ব্যবহারের দিক। আরো কিন্তু দিক আছে। একাধিক দিক আছে। সেই সকল দিক সচরাচর প্রকাশ পায় না।

মা যে লীলা করতে চান। হারে এবং জিতে, সৌন্দর্যে এবং মাধুর্যে, বৈচিত্রে এবং খুশিতে মা চান খেলাটিকে বজায় রাখতে। আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু শ্রীমানদাদু হঠাৎ ক'রে বলত—লেগে যাও নারদ। নারদ সর্বদাই পিছনে লাগতেন। এখনো তাঁর সেই লাগা অব্যাহত। প্রতিদিনের খবরের কাগজে সেই সব লাগার কথাই তো প্রকাশ পায়। সেই সব অকাট্য যুক্তি, প্রকাণ্ডকাণ্ড, বিবিধ বৈচিত্র, আশ্চর্য সৌন্দর্য। তার ফলে অঘটন সব ঘটছে। কী নয়? সুচিত্র এবং বিচিত্র। চারিদিকেই অপরিসীম বৈষম্য। চলেছে আর চলেছে।

খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াতেও আপত্তি আছে। যা নয় তাই। বিপদ এই, এস্‌ফার ওস্‌ফার ক'রে উঠতে পারছি না। কি করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। সমস্তই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শেষ কাটালে এই কথাটাই মনে পড়ছে—মারা যায় বাউন করা যায় কি? সবই হ'ল কিন্তু কিছুই হ'ল না। শেষ পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরুলো—তাই তো। দেখছি এই মন্ত্রটাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল। তাই তো আর তাই তো। বাস্‌ এই পর্যন্ত। এখন এই পর্যন্ত।

পরিচ্ছেদ—৮

গাছের ওপর মহাপুরুষের কথা বলেছি। সেই গল্পই এবারে করব। একদিন একটা ঘরে ব'সে আছি। খবর এল, এখানে কাছাকাছি কোথায় যেন একটা গাছের উপরে একজন মহাপুরুষ বাস করেন। তিনি না কি অত্যন্ত রকমের মহাপুরুষ। তাঁর কথা জেনে অবধি আমরা অনেকেই ভয়ে

একেবারে কাঁটা। তিনি থাকেন গাছে, মাটিতে নয়। কোনোসময়েই তিনি মাটিতে নামেন না—এমন কথা হলফ ক'রে বলতে পারি না। কেমন ক'রে সে কথা বলব।

আমি তখন ৪/৪, একডালিয়া রোডে গীতার ব্যাখ্যা করি। মহাসমারোহে সেই ব্যাখ্যা চলে বিকেলের দিকে। আমি কি পারি না-পারি সে কথা এইখানে জাঁক ক'রে বলছি না। তবে আমি বসতাম ঠিক ভোলানাথবাবার প্রস্তরমূর্তিটির পাশেই বিশেষ জাঁকের সঙ্গেই বলতে পারা যায়। মাটির মেঝের থেকে অল্প কিছু উঁচুতে। একডালিয়া রোডে বালিগঞ্জে সমারোহ মন্দ নয়। আমি গীতার ব্যাখ্যা করতুম সপ্তাহে দুটি দিন, কখনো বা একদিন। এটুকু মনে আছে, গীতার দিনে আমাদের নীচেকার হল ঘরটি লোকে লোকে আলোকিত হয়ে যেত, জনে জনে হ'ত সমাকীর্ণ। আমার একটা সাধারণ ধারণা, আমার দ্বারা তেমন কোনো মহৎ কাজ হয় না, আমি তার যোগ্যই নই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ভাবও আমার অন্তরে আছে, যেমন চাই তেমন পারি। বাইরের দিকে academical পরীক্ষা পাশ করা আমার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস। ওর মধ্যে আমি যেতেই চাই না। যেতে চাইও নি—যেতে চাইও না।

শ্রীযুক্তঅবনী শর্মা আশ্রমে পূজোর দিকটা সামলে থাকেন। অবনীদার সঙ্গে আমার বহুকালের আলাপ পরিচয়। সেই বহরমপুরে তাঁর সঙ্গে ছিল আমার দহরম মহরম। পরে কলকাতাতে এসে তাঁর ছেলে শিখতে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। দক্ষিণ কলিকাতায় দক্ষিণী ব'লে একটি শিক্ষা সংস্থায় তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। শিখেছিলেন অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব একটি ধাঁজ আছে। অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীতই সেই ধাঁজ মেনে চলতে থাকে। সুরের দিক দিয়ে সেই সব সঙ্গীত আমার যেন কিছু একঘেয়ে ঠেকে। আমি নিজে সামান্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলাম। সেখানেও তাই। তবে জানতে পেরেছি, এই চিরাচরিত styleটি অতিক্রম ক'রেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের গতি আছে। সত্যিই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবিধ সব বৈচিত্রে, বৈশিষ্ট্যে গীত হয়। এমনকি প্রচলিত পন্থা অতিক্রম ক'রেও

রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্য নানান রকমে গীত হ'তে পারে এবং গীত হয়ে থাকে। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কোনো কিছুরই দারিদ্র্য নেই।

শিশুকাল থেকেই আমি গান শিখেছিলাম ওস্তাদের কাছে। আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা একেবারে যে হ'ত না তা নয়—যতদূর মনে পড়ে। হরেকরকম গানের চর্চাই আমাদের মধ্যে চালু ছিল।

পরে ঘটনা এই ঘটল—আমি ঢুকে পড়লুম একেবারে শান্তিনিকেতনে। ওইখানে আমাদের একটি আশ্রমও স্থাপিত হ'ল। শান্তিনিকেতনের আমরা বাসিন্দা হয়ে গেলাম—একথা বললে কিছুমাত্র কিছু ভুল করা হয় না। আমরা কিন্তু এখনো তাই। আমার কথা বলি। আমি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি। শুধু ভালবাসি নয়, একটু বেশীরকম ভালবাসি। তবে একথাও ঠিক, গানের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে আমরা একেবারে অন্তরস্থ ক'রে নিতে পারিনি।

এককালে ভাবতুম রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয় ইনিয়ে বিনিয়ে এবং এঁকিয়ে বেঁকিয়ে। এখন দেখতে পাই, ওরকম গান যে গায় সে গায়, যারা গায় তারা গায়। রবীন্দ্রনাথকে দোষ দিয়ে পাপের ভাগী হ'তে যাব কেন? যদুভট্টের কাছে তিনি গান শিখেছিলেন। যদুভট্টের সুরের সৌন্দর্য, তালের বৈচিত্র রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এখনো নিশ্চয় পক্ষ-বিস্তার ক'রে রয়েছে। তা ছাড়া আরো রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি ধারা। সে ধারাও, আমার মনে হয় অদ্ভুত এবং অপূর্ব। সত্য সত্যই সুন্দর। নিজস্ব ভঙ্গীতে একেবারে অভূতপূর্ব।

এই বিশ্বে গানে এবং নৃত্যে কত শত বৈচিত্র যে প্রকাশিত হয়েছে সে কথা কুশলীরাই অবগত রয়েছেন। বাকীদের বেশী জানার কথা নয়। আমার সামান্য জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তাতেও আমি অভিভূত হয়েছি—এ কথা নিশ্চিত। তবে তুলনার মধ্যে যেতে আমি চাইনে। ছেলেবেলার থেকেই গান শুনেছি এবং বাজনার রসে ডুবেছি। একবার নয়, বহুবার। আমার চারপাশেও গানবাজনার আবহাওয়া সর্বদাই বহাল থাকত। ভোরবেলা উঠেই বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক দিনই

আমি শুনতে পেতাম দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের গান খালি গলায় এবং মধুর স্বরে। অপূর্ব এবং বিচিত্র।

আমার সেই ছেলেবেলাকার মনে সেই আত্মীয়টির গান বেশ গভীর দাগই কেটেছিল। তখন হয়তো আমি ঠিকমত কৈশোরেও পৌঁছুইনি। অথবা তখন নতুন জীবনের নবীন প্রাণ আমার দেহেমনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে।

আমার পিতার business এর সেই সময়ে পড়তির দিক শুরু হয়ে গেছে। বাবার এই একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক ছিল, বাবা কখনো আমাদেরকে business সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রায় কিছুই বলতেন না, ও-সবের ভাগী করতেই চাইতেন না। আমার যেন মনে হয়, ম'রে গেলেও নয়। বরঞ্চ আমাকে নিয়ে অথবা আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝে প্রায়ই বসতেন। বিষয় থাকত পড়াশুনোর চর্চা।

বাবার কথা উঠেছে, বাবার কথাই আর একটু বলি। ফুটবল খেলা বাবার কাছে অত্যন্ত রকমের প্রিয় ছিল। যৌবনে তিনি একটি ক্লাবের পক্ষ হয়ে খুব না কি খেলতেন। আমাদের ঘরে একটা টিমের সঙ্গে বাবার একখানি ছবিও ছিল।

ছবির কথা উঠল। ছবির কথাই ব'লে ফেলি। অথবা ব'লে রাখি। আমাদের উপরের ঘরে অর্থাৎ বাবা মায়ের ঘরে কয়েকটি বিশেষ ছবি থাকত। সব বাড়ীতে এক রকম হয় না তবু সকল বাড়ীতেই কিছু-না-কিছু ছবি সাজানো থাকত—আশ্চর্য এবং সুন্দর। তখন আমাদের কেউ নিজেদের বাড়ী তৈরি করেনি। ভাড়া করা একখানি বাড়ীতেই আমরা থাকতুম। সেই বাড়ীরও বদল হ'ত। আমাদের ব্যবসার চলতি অবস্থা এবং শেষ অবস্থা—সমস্তই আমার চোখের সামনে দেখা। সেই অবস্থায় আমার ঠাকুমা কখনো কখনো কাঁদ কাঁদ স্বরে বলতেন, আমি কই কি, একটা জমি কিন্যা ফালাইয়া রাখ্। কইলকাতায় আর কিছু পারস আর না পারস একখণ্ড জমি ফালাইয়া রাখতে দোষ কি।

তখন কিন্তু এইটি ঘটেই নাই। শ্যামবাজারের কাছাকাছিই দেশবন্ধু

পার্কের কাছে জমি কেনবার মত কথা আলোচনা অনেক হয়েছে। আমরা ছেলেমানুষ, সমস্ত দাঁড়িয়ে শুনতাম। কিন্তু তখন আর কার্যতঃ কিছুই হয়নি। ঠাকুরমা সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ও সব কিছুই হয়নি। Business-এর অবস্থা—বই এর business, stationery goods-এর business এবং কবচের দিকটাও ক্রমেই নিভে আসতে লাগল। হয়তো কিছু মঙ্গল এর পিছনে রয়েছে। আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। শুধু দেখতে পেতুম ভাইরা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। বাবার কিছু কিছু ঋণ হয়ে গেল। সেই সব পরিশোধ হ'তেও সময় লেগে যাচ্ছে। তার উপরে আমার বড় বোনের বিবাহ। তখনকার দিনে সে একটা এলাহি ব্যাপার। আমার বেশ মনে আছে, বিবাহের দিনটিতে আমরা কয়েক ভাই এবং আরো দু এক জন বাইরের লোক সবাই মিলে যুদ্ধের বেশে সজ্জিত হয়ে বিবাহ স্থলে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন সেখানে বর এসে গেছে।

আমাদের সব বলা কওয়া ছিল। আমরা সব তৈরিই ছিলাম। নতুন বরকে লক্ষ্য ক'রে আমি আঙুল নেড়ে বলতে লাগলাম, কে হে তুমি? কোন্ দিগ্বিজয়ী বীর? ভেবেছ কি মনে? দুর্গ অধিকার করিবে সহজে। এইসব কথা এবং আরো অনেক কথা খুব তেজের সহিত উচ্চারণ করিতে ত্রুটি করিলাম না। যতদূর মনে পড়ে এ সব পংক্তি ছাপানোও হয়েছিল। আমাদের কাব্য ছাড়া আরো অনেক সস্তার কাব্য মুদ্রিত অবস্থায় বিবাহ-ক্ষেত্রে বিলি করা হয়েছিল। বাড়ির ছাদেতেই এইসব কাণ্ড-কারখানা। শেষ কাটালে সন্ধ্যাকালে বাড়ীর উঠানে বরবেশী কমলদার আগমনের পর আমি উচ্চারণ করতে লাগলাম।

ব্যাপারখানা সাজিয়ে দিয়েছিলেন আমার দাদাবাবু—সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি পূর্ববঙ্গের এক বিশ্রুত পুরুষ ছিলেন—বহু গানের যিনি রচয়িতা এবং দু তিনখানা গ্রন্থেরও যিনি প্রণেতা-পুরুষ।

এই কথাটা এই স্থলে উল্লেখ না ক'রে পারছি না। সেই বিবাহের বর ছিলেন আমাদের কমলদা—এখন যিনি আমাদের আনন্দময়ী আশ্রমের

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কোথায় তিনি থাকেন জানি না। এই কলকাতাতেই কোথাও হবে। তাঁর সম্বন্ধে আমি একটু স্পষ্ট ক'রেই বলতে পারি, তিনি কিছুতেই ম্যাদাটে পুরুষ ছিলেন না। আশাকরি এখনো নহেন। বেঁচে আছেন কি? বেঁচেই তিনি থাকুন। তাঁকে যতদিন দেখেছি—দেখেছি তিনি এক বিশিষ্ট পুরুষ বটে। মতের ভেদ আমাদের রয়েছে নিশ্চয়। তবু তিনি a man among men. তিনি যেখানেই থাকুন, আমার অন্তরের নমস্কার তাঁকে জানালাম। এটাও তাঁকে এবং অপর সকলকে জানাই, সত্যের পথের পথিক আমি। আমার যা কথা মানুষকে জানিয়ে যাব। তাই তো আমার এই প্রয়াস। তারপরে যা হয় হোক।

কমলদার কথা উঠেছিল। কমলদার প্রসঙ্গ আমার জীবনেতে অনেক দূর পর্যন্ত চলেছে। অনেকবার এসেছে এবং গেছে। অনেক লোকের মুখেই অনেক কথা শুনেছি। ভেবেছি অনেক কিছু তাঁর বিরুদ্ধে এবং পক্ষে। শেষ পর্যন্ত বলি, আমি তাঁকে ভালইবাসতুম। গুজরাট অঞ্চলে তিনি একটা বিরাট রকম পরিভ্রমণ অথবা পরিক্রমা করেছিলেন—সে কথা আমি শুনেছি—তাঁরই নিজের মুখে আমি শুনেছি। গুজরাটের নর্মদা কিনারের অঞ্চল তাঁর সুপরিচিত। আমারও সুপরিচিত। তাঁর সঙ্গে আমার এই যোগসূত্র একেবারেই আকস্মিক না অন্যরকম সেটাও আমার কাছে ভাববার মত একটি কথা।

কমলদার কথা এত গভীর ক'রে মনে পড়ছে কেন সে কথাটাও আমি চিন্তা করছি। কমলদা আমার জীবনে এসেছিলেন খুব একটা অল্প বয়সে তো নয়, আমার কৈশোরেই বটে। কমলদা ব'সে ব'সে আমার গান শুনতেন—সেই কথাও আমি একেবারে ভুলে যাইনি।

পরিচ্ছেদ—৯

শিবপুরে আমি গিয়েছিলুম একবার না দু বার। একবার তো খুব স্পষ্টই মনে আছে, সুধীর গুহর মেয়ে ডলি এবং জলি আমাদের সঙ্গে ছিল।

সে কত দৌড় ঝাঁপ, কত যে রঙ্গ রস তা আর বলার কথা নয়। সবাইকে নিয়ে না হ'লেও অনেককে নিয়ে—অন্তত কারো কারোকে নিয়ে আমরা কোথাও কোথাও চ'লে যেতুম। কীর্তনের টানেই যেতুম বেশী। কত ছন্দ, কত আনন্দ। দূরে সুদূরেও চ'লে যেতুম আমরা সকলে। দমদমেতে গিয়েও অসংখ্য লোকের সামনে আমরা কীর্তন করেছি। একবার নয়, বার কতক। ঠিক মনে পড়ছে না কতবার। এ কথা নিশ্চিত যে, দমদমে লোকজনের সমুদ্রের সামনে আমরা গান গেয়েছি। সেই খগেন-বাবুদের সান্নিধ্যে। সেখানকার ইতিহাসও খুব একটা কম নয়। আমার যেন মনে হয়—আমি একটা কী মানুষ যে আমাকে নিয়ে এত কাণ্ড-কারখানা। বেশ মনে পড়ে দমদম অঞ্চলে লোকে লোকে লোকসমুদ্র। আমাদের দলটা খুব একটা বড় দল নয়। তবু সেখানেই আমরা একাধিক-বার গিয়েছি। নিজেরাও পাগল হয়েছি অপরদেরও পাগল করেছি। কারোকে পাগল করার সাধ্য কারোর নেই। সমস্ত সুতো একজনের হাতে। সে সুতো টানছে। তাইতেই হাজার খেলা চলছে।

বিশ্বের খেলা সমস্তই তার। সে যেমন যেমন করিয়েছে তেমন তেমন আমরা করেছি। করতে আমরা বাধ্য। 'পুতুলবাজীর পুতুল আমরা।' সে যেমন নাচায় তেমন নাচি। একজনের একটা গানের কথা তুলে আমি আমার কথাটা বললাম।

খগেনবাবু আমাদের মহেন্দ্রবাবুর ছিলেন খুড়তুতো ভাই। খগেনবাবুর টানে আমরা চ'লে গিয়েছি একবার নয়, একাধিকবার। প্রত্যেকটি সমাবেশ অপর্যাপ্ত লোকে লোকে আকীর্ণ অথবা সমৃদ্ধ যেমন কলকাতায় তেমন কাশীতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটা যুগের যুগপুরুষ—এ বিষয়ে তো কোনো কথাই নেই। সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো হয়তো কত কিছু। কত শত মানুষকে তাঁর আলোক অথবা তাঁর প্রেরণা তৈরি ক'রে আশ্চর্য উন্নতির পথে চালিত করেছে—এ তো সবাইকারই চোখে দেখা সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের উত্তাপে কত শত সহস্র ব্যক্তি উন্নতির পথে অথবা অগ্রগতির

পথে এগিয়ে গিয়েছে। আমার নিজের জীবনটাও তো তাই। প্রথমে রামকৃষ্ণ-প্রভাবই আমার জীবনের উপর পড়েছিল। পরে যা কিছু আসুক, প্রথমে সেই রামকৃষ্ণ। সেই রামকৃষ্ণ আর সেই রামকৃষ্ণ।

পরে দেখতে পেয়েছি আগের আগে আর একটা আগ আছে। সেখানকার কথাই আমার ঠিকমত অন্তরের কথা। কোন্‌টা আমার অন্তর তাই তো খুঁজে পাচ্ছি না। কোন্‌খানে আমার অন্তর সেটাও পাই না। যেখানে খুঁজছি সেটাই কি আমার জীবনে বিশেষ একটা স্থান ? বিশেষ এবং শেষ এই দুটো কথাই শেষকালে আমার কাছে এক পারা হয়ে আসছে। সেখানে কি জীবনের চরম আন্তরিকতা ? সেই অভ্যন্তরেই কি আমার অন্তরের পরমা শান্তি ? না কি শান্তি কোথাও নেই। শান্তি। শান্তি। শান্তি। শান্তি তো কোথাও নেই। কোনোখানেই তো শান্তি চোখে পড়ে না অর্থাৎ মনের অনুভূতিতে আসে না।

আসল কথাটা বলব আমি ? যে কথা কখনো কোথাও বলা হয়নি সেই কথাটাই তো বলতে হবে। সেই কথাটাই তো বাকি আছে। আর সমস্ত বলা হয়েছে। কিন্তু সেই কথাটা কেউ কোথাও কখনো বলে নি !

সেই কথা যে এক আশ্চর্য কথা। আশ্চর্য শুধু নয়, পরমাশ্চর্য। কিন্তু সেই কথা আনন্দের কথা। এমন একটি আনন্দের সময় আসছে যার সংবাদ কেউ কখনো কোথাও কোনো রকমেই বলেনি, অথবা প্রকাশ করেনি। আমি শুধু আমার এক গুরু মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গোপীনাথ কবিরাজের মুখে এই ধরনের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। তারও পূর্বে কেমন ক'রে জানিনা খবরটা আমার কাছে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিল। জবর খবর।

সকল মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে আনন্দের ধারা একদিন নামবেই। আর সেই দিন খুব বেশী দূরে নয়। এসে গেছে আমাদের এই জীবনের কাছাকাছি। কার্যে পরিণত হ'লে দেখতে পাব। পরে দেখতে পাচ্ছি এই কথা তো শুধু বাইরের কথা নয়, এ আমারই বুকের কথা।

অনেক দিন চ'লে গেছে এবং যাচ্ছে। এতদিনে এ কথা ঠাণ্ডা মেরে যেত, না, এখনো তো ঠাণ্ডা নয়। এখনো যেন একটু উত্তাপ এর ভেতর

থেকে পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি এই উত্তাপ জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপ। কোথায় যেন এক টুকরো আগুন লুকিয়ে আছে। সেই আগুন যে জ্বালালেই জ্ব'লে ওঠে। কিন্তু নেভালেও নিভে যায় না। নেভানো যায়ই না।

আমি ব'সে আছি। আমি ব'সে আছি আগুনের আশায়। কোনো কোনো পাখি ব'সে থাকে জলের আশায়। আমার কাছে আগুনের আশাই জলের আশা। আমার এই তৃষ্ণা মেটাবে জল নয়, আগুন। হয়তো বা জ্ঞানের আগুন। যে আগুনই বল, সেই আগুনই বটে। তবে আগুন। এই আগুন কি গহন অরণ্যে দহন এনে দেয়?

কি রকম কি ঘটে বলতে পারি না। কেননা সে দূরের কথা। কি রকম কি—কে জানে। কিন্তু সেই আশাতেই ব'সে আছি। যদিও কিছুই আমি বুঝতে পারিনি এখনো পর্যন্ত। তবু আমি ব'সে আছি। আমি যে ব'সে থাকব। আমি ব'সে থাকবই। আমি আশা করবই। আমার চির অপেক্ষা, উপেক্ষাবিহীন অপেক্ষা আমার। চিরকাল। চিরটা কাল।

এরকম আশা আর কি কেউ করেনি? খবর যেন পেয়েছি, আরো কেউ কেউ এবকম আশা করেছেন, ক'রে আসছেন অথবা ক'রে চলেছেন। আমি কোন্‌খান থেকে এরকমটা আশা-ভরসা করতে শিখলুম সে কথা এখন বলতে পারছি না। শুধু বলছি আশা আমি ক'রে থাকি। হয়তো বা আরো কেউ কেউ আশা করেছেন অথবা ভরসা করেছেন। হয়তো বা আরো এক আধজন বা দু চার জন এরকম একটা ভরসা ক'রেই চলেছেন। যুগ পাল্টে যাবে। অথবা যুগের হাওয়া পাল্টে আর এক রকমের হাওয়া বইতে থাকবে। যেমন ছিল তেমন কিছুই রইবে না। সকল কিছুই বদলে যাবে। বদলে গেল ব'লে। তবু কি হবে কে জানে।

পরিচ্ছেদ—১০

বহু বছর আগের কথা। আমি কোডারমায় উপস্থিত হয়েছি। ঝুমরি-তিলাইয়া থেকেই আমি এসেছি কোডারমায়। আবার কোডারমা থেকে

চ'লে এলাম শিবসাগরে। শিবসাগর নামটি আমার বড়ই প্রিয় নাম। শিবের সাগর, তাই তো বলা হয়েছে শিবসাগর। বড়ই সুন্দর নাম। শিবের সাগর—শিবসাগর। বড়ই মধুর মনমাতানো নাম। এখন আমি শান্তিনিকেতনে বারান্দায় ব'সে লিখছি অথবা লেখাচ্ছি। শিবসাগর এখনো কি সেই রকমই আছে। আসামে একটি শিবসাগর আছে শুনেছি। আমাদের এই শিবসাগরটি বিহারের শিবসাগর। আবার আমার বিশ্বাস-মতে বিশ্বটাই শিবের সাগর—সমস্তই শিবসাগর। সমস্তই যে শিব। সমস্ত সংসারই শিবের বিস্তার। আর তো কিছুই নয়।

কিন্তু কে যেন কবে এই সাগরের মধ্যে একটি ঘুর্ণিজল তৈরি করেছিলেন। কেমন ক'রে যেন হয়েছিল। সাদা, সরল, তরল জলই পাক খেয়ে ঘুর্ণিজল হয়ে উঠল। কেমন ক'রে যে হ'ল সেই কথাটাও একটা কথা। শুধু কথা নয়। কথার মত কথা। যাকে বলে বিশেষ কথা। কোন্ হাওয়া লেগে, কোন্ সে কারণে, কার ছোঁওয়া পেয়ে জলটা ঘুর্ণির রূপ নিল সে কথা আমার জানা নেই। ছিল আকাশপারা বিস্তার, হয়ে পড়ল রঙে রঙে রঙীন সুন্দর এক খেলা। খেলা হয়ে পড়ল। খেলাই চলতে লাগল। অনেক পণ্ডিত ব'লে থাকেন, খেলাই ছিল এবং খেলাই চলতেছে। এই রকমই।

কোডারমায় গিয়ে শিবসাগর নামক পাহাড়ী জায়গাতে আমরা সেই উপস্থিত হয়েছিলাম। অনেকগুলো দিন শিবসাগরে কেটে গেল। একেবারে খুব একটা বেশী দিন নয়। বেশ কয়েকবারে অনেকগুলো দিন। এখনো ক'লকাতাতে পারুল প্রভৃতি বাস করে। পারুলের মাকেও দেখলাম। ওরা সবাই ক'লকাতার বাইরে অথবা ক'লকাতাতে নিজেদের আনন্দে নিজেরা বাস করে। ক'লকাতায় পারুলের স্বামী কি যেন কি কাজ করেন। আর পারুল নিজে সেই বাটানগরের একটা স্কুলে পড়াতে যায়। বাসের পর বাসে উঠে তিনবার বাস বদ্‌লে চারটে বাসের সওয়ার হয়ে পারুল তার কাজে যায়। আবার ওইভাবে ফিরে আসে। আমি যখনই ভাবি তখনই আশ্চর্য মানি। মনে মনে বলি, কি আর করা যাবে। গেরো

মশাই গেরো। পারুল নিতান্তই মায়ের মতো। তাই আর চড়াও হয়ে চড় মেরে বসি না। পারুলকে তার বিয়ের আগেও দেখেছিলুম। তার বিয়ের অনেক পরেও দেখতে পেয়েছি। সে ভাল থাকুক, এইটাই আমার ইচ্ছা। সে বেঁচেবর্তে থাকুক, এইটাই আমার বাসনা। পারুলের শাশুড়ী-মাতাও আমার কাছে আসেন। তাঁরা সবাই আপন আপন হিসেবে ভাল লোক। মন্দ লোক এই জগতে কোথাও তো দেখতে পাই না। ভাল ছাড়া কেউ কোথাও নেই।

তবে কি না আমার ভাল লোকেও চলবে না। মন্দ লোকে তো চলবেই না—একেবারেই না। ভাল লোকেও কাজটা সমাধা হবে না। আমার কাছে এবং কাজে dose টা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়া চাই। সাধারণ dose নয়, দরকার overdose. এদিকে আবার overdose হ'লেও বিপদ। কোথায় বা যাই, কি যে করি—সেইটেই হয়েছে আমার ভাববার বিষয়।

কোন্ দিক দিয়ে যে ফোঁস্ ক'রে উঠব সেইটেই চিন্তা করছি আমি। সেখানেও বিপদ। ফোঁস্ করলেও কি রক্ষে আছে। ফোঁস্ একটুখানি করলেও কেউ অথবা কেউ কেউ অমনি নাকি সুরে কী যেন ব'লে উঠবে বিচ্ছিরি ভাষা। আমার তখন অন্য পন্থা দেখতে হবে। হয়তো এক ফুঁয়ে নিভে গিয়ে অন্ধকার। তখন আবার দেশলাই ধরাও, সলতেটাকে আবার জ্বালাও। ঝকমারি আর কাকে বলে।

ছিলাম ঝুমরিতিলাইয়া। চ'লে গেলাম কোডারমা। গাছে এবং গাছাড়িতে চারিদিক সুন্দর। ছোটো ছোটো পাহাড় মাথা তুলে আছে। নবদা এবং বংশীদার আকর্ষণে আমি শেষে গিয়ে পড়েছি সেই শিবসাগরে। মাটি আছে কাদা নেই। এখানে শিবসাগরে শিব আছেন, সাগর নেই। আকাশ আছে, পাতাল নেই। এই রকম হ'ল আমাদের শিবসাগর। এমন সব চক্‌চকে সুন্দর কালো বড় বড় পাথর মাঝে মধ্যে রয়েছে যে অবাক মানবার মতো। আমি অবাক মেনেছিও।

ওই অঞ্চলে অভ্রের খনি চারিদিকে। সাঁওতালের বসতিও এদিকে, ওদিকে, অনেকদিকে। আমরা ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম। একটা দিকে

বেশ খানিকটা গেলে পরে শিবসাগর। সেইখানেতে একটি স্থান সাহেবদের দ্বারা অধিকৃত। আমার স্নেহভাজন কয়েকব্যক্তি ওখানে বাস করতেন। আমার সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল ওইখানেই।

আমি যে বাড়ীতে থাকতুম সেই বাড়ীটা অভয়বাবুর বাড়ী। আমি যাওয়ার পরও অভয়বাবু কয়েক বছর বেঁচেছিলেন। তারপরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তাঁর দেহত্যাগ। আমি দূরের থেকে শুনতে পেয়েছিলাম।

অন্যান্য অনেক জায়গাতে যা হয় এখানেও তাই হয়েছিল। অনেকের সঙ্গেই আমার ভারি খাতির জ'মে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে জুটেছিল একদল ছেলেমেয়ে—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। আমি তাদের সঙ্গে খুব মজা করতুম। তাদের নিয়ে বেড়াতুম, তাদের সঙ্গে গল্প করতুম, তাদের সঙ্গে হৈ হৈ করতুম। আবার তাদের সবাইকে অনেক কিছু শেখাতুম। শিক্ষাটা আপনি হয়ে যেত।

তাদের সঙ্গে সে কি ধুম। শিবসাগরে গিয়েছিলাম কয়েকবার। ক'বার যেন। সমস্ত বিষয়েই ধুম প'ড়ে যেত। যা করতাম তাতেই ধুম। ফটো তোলা হয়েছিল। সে সব ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমার ফটো এখনো বোধহয় কারো কারো কাছে টিকে আছে। আমার কাছে আসা যাওয়া আছে এখনো তাদের কিছু লোকের। পারুলের বোন শংকরী দু বিষয়ে দুটো এম. এ. পাশ করেছে। এই কিছুকাল পূর্বে আমার কাছে একবার এসেছিল। সে যেন কোন্ এক ব্রহ্মচারীর শিষ্য। আমি তাদের সকলকে নিয়ে সেই পাহাড়ে পাহাড়ে—সেই জঙ্গলে এবং ময়দানে কত যে খেলা খেলে বেড়াতুম তা কেমন ক'রে বলি। পাহাড়ের উপরে সমতল জায়গায় পাথরের বড় বড় চাঁই এক আধটা প'ড়ে থাকত যেখানে সেখানে। দেখলে হঠাৎ মনে হয় ঠেলা দিলেই প'ড়ে যাবে। কিন্তু নড়ায় কার সাধ্য। এই-ভাবে জ'মে ওঠে কোডারমা অঞ্চলের পালা। সাঁওতাল জাতীয় লোক সেখানে। দূরে সুদূরে, কতখানে। একটা কথা মনে ভাবি, সব মানুষেরই মূল স্বভাব একই রকম। এখানে সেখানে একই মানুষ। গান গাইছে,

কথা বলছে, ঝগড়া করছে সেই একই মানুষ। অন্য রকমের মানুষ কোথা থেকে আসবে। একটা রকমের মধ্যেই নানান রকম। একের মধ্যেই নানা রকম হের এবং ফের। এখানেও যা, ওখানেও তা। সেখানেও আবার ওই রকমই বটে। যেখানেই মানুষ সেখানেই মানুষের কাণ্ড। আবার সেখানেই মানুষের কাণ্ড এবং কারখানা। মানুষ মানুষ আর মানুষ চারিদিকে। ভগবান না কি মানুষকে গড়েছিলেন তাঁর নিজের আদলে। ভগবান কি দিয়ে কি করেছিলেন সে কথা জানা নেই। তাই চুপ ক'রে থাকাই ভাল। দিল্লীর জিতেন দত্তের দাদা ধীরেন দত্ত প্রায়ই বলতেন, চেপে যাও চেপে যাও। অনেক জায়গাতে আমি চেপে যাই।

পরিচ্ছেদ—১১

এরপর আসছে আমার জীবনের কতগুলো বিশেষ কাহিনী। সেই কথাগুলো লেখবার সময় মনে মনে ভাবছি আমার জীবনের এইসব বিচিত্র কিন্তু সত্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি আমি। আমার জীবনের সবটাই বিচিত্র কাহিনী। যত অধ্যায় সবগুলোতেই আশ্চর্য কাহিনীর সমাবেশ। এখন করা যাবে কি। এইরকমই ঘটনা। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার যে মিলন হয়েছিল সেই কথাগুলো এইখানেই থুয়ে দিলাম। মহাত্মা গান্ধী যে আমার জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছিলেন। সেইসব কাহিনী আমি এইখানেই গেঁথে ফেলবার চেষ্টা করছি—যথাসম্ভব।

এ যেন একটি ফুলের মালা গাঁথা হচ্ছে। আমার একটু তাড়াহুড়ো করবার দিকে ঝোঁক। বিশেষ ক'রে কতগুলো ঘটনা আমি এইখানেই গেঁথে রাখি।

গান্ধীজী আমার জীবনে এসেছিলেন।

গান্ধীজী এইখানেই থাকুন না কেন। এইখানে থাকলেই তো ভাল হয়। তাই এই তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত হিসাবে আমি সে সব ঘটনা গেঁথে

ফেলছি আমার এই পুস্তকের এই অংশটিতে। এইখানেতেই থাক্ সে সব কথা।

১৯৪৭ সাল। কলকাতায় ছিলুম। বেশ ছিলুম। ঘাড়েতে ভুত চাপল। মানে আমার হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল আমি গান্ধীজীর কাছে গিয়ে পৌঁছব। শুনতে পাচ্ছি গান্ধীজী চ'লে গিয়েছেন নোয়াখালি অঞ্চলে। আমিও সেইখানে যাব। সেইখানে আমি যাবই।

যেই কথা সেই কাজ। চ'লে গেলাম আমি সেই পূর্ববঙ্গে। আমার বিবাহের সামান্য কিছু পরেই এই ঘটনা।

আমার জীবনে কিছু কিছু বৈচিত্র এবং বৈপরিত্যের সমাবেশ দেখতে পাই। 'কিছু কিছু' কথাটা বললাম বটে, কিন্তু দেখতে পাই প্রায় আগাগোড়াই এই কাণ্ড। সবখানেতেই এই ব্যাপার। বৈচিত্র আর বৈপরিত্য একসঙ্গে অনেকখানি জায়গা অধিকার ক'রে রয়েছে। তাই আমার জীবনের প্রায় সমস্তটাই আশ্চর্য আর আশ্চর্য।

যে গল্প অথবা যে কাহিনী আমি লিখতে যাব সেখানে রয়েছে আমার জীবনের নিতান্ত জীবন্ত একটা দিক। আমার আত্মজীবনীর তৃতীয় অংশে এইটিকে স্থাপনা ক'রে এখনকার মত আমি চুপ করব। তারপরে আবার হয়তো কথা বলব।

কলকাতার থেকে আমি চ'লে গেলাম সেই পূর্ববঙ্গে। সে অনেকখানি পথ। অনেক নগর এবং বন্দর পার হয়ে, নদীনালা খানাখন্দ ডিঙিয়ে পৌঁছে গেলাম আমি একেবারে ভারতবর্ষের এদিক থেকে ওদিক। এসফার থেকে ওসফার। কিছু নয় সেটুকু আমি জানি। তবু চ'লে যাচ্ছি অনেকখানি। যা থাকে কুল কপালে। চলেছি, এগিয়ে চলেছি।

অনেক দূরের পথ, সেই পথ অতিক্রম ক'রে হিন্দুস্থান থেকে আজ-কালকার পাকিস্তানে পৌঁছে যাচ্ছি।

আমি এসে গেছি গোয়ালন্দ হয়ে একেবারে পূর্ববঙ্গে। ছিলাম পশ্চিমবঙ্গে, এসে গেলাম পূর্ববঙ্গে। ছিলাম একদেশে, এসে উপস্থিত হ'লাম আর এক দেশে। একটা দিগড় থেকে একেবারে আর এক দিগড়।

চ'লে যাচ্ছি আর চ'লে যাচ্ছি। সবেমাত্র বিয়ে করেছি। অনেক দিকে অনেক টান। যে দিকে যত টানই হোক আমার এখন একটিমাত্র টান—আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে পৌঁছতেই হবে।

মহাত্মা গান্ধী আমায় আকৃষ্ট করেছেন। আমাকে তিনি চিরকালই আকৃষ্ট করেছেন। শুধু আজ নয়, অনেক দিনই।

আরো অনেকদিন আগের কথা। ৬৪ বি, জয় মিত্র ষ্ট্রীটে যখন আমি থাকতাম তখনও তাই।

যে কোনো মহৎ ব্যক্তি আমায় আকৃষ্ট ক'রে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মহৎ যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি আমায় যেন ডাকতে থাকেন অথবা টানতে থাকেন। এ কী ডাক। এ কী টান। এ কী আকর্ষণ। বড়রা সবাই আমাকে ডাকে। বড়ো জিনিস আমাকে কেন, সবাইকেই ডাকে। অন্তত অনেককেই ডাকে।

কেন ডাকে কে জানে। হয়তো বা এই ডাক অনাদি এবং অনন্তের ডাক। সবাই কি শুনতে পায়? সবাই হয়তো শুনতে পায় না ঠিকমতো। এ যেন শ্যামের বাঁশী। অথবা এই ডাক যেন জননীর ডাক অবোধ সন্তানকে—ওরে ফিরে আয়, সবাই তোরা ফিরে আয়। কে কোথায় গিয়েছিস আমার আপনার জন। তোরা সবাই ফিরে আয় আমার কাছে।

এক কবি ব্যবহার করেছেন একটি শব্দ, 'মরণ টানে'। মরণের টান সকলকেই টানে। তাই তো সবাই আগু পাছু না বুঝে—না ভেবে মরণের মুখে গিয়ে পড়ছে। ওই ডাক না শুনে পারা যায় না। সেখানে যেতেই হবে। বোঝো না বোঝো—চাও বা না চাও যেতেই হবে সেই মরণের অভিমুখে, গতি সেইখানেই। সকলেরই গতি, প্রত্যেকেরই গতি।

যে কথা বলছিলুম সেই কথায় আসি। আমি ছু'টে চ'লে গিয়েছি পূর্ববঙ্গে বাঙাল দেশে। আমাদের দেশ বটে, তবে আমার সঙ্গে তেমন যোগ নেই। ছেলেবেলাতে এবং পরবর্তী কালে আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম বটে, তবু আমার সঙ্গে তেমন একটা সম্বন্ধ নেই।

তেমন একটা সম্পর্ক আমার কারোর সঙ্গেই নেই। কখনই ছিল না। কুত্রাপি নয়, কুত্রাপি নয়।

আমি এই বিশ্ব জগতে এসেছি খেলা করতে। খেলা হয়ে গেলেই চ'লে যাব। খেলা বটে, তবে অন্য রকম খেলা।

কেন? কেন সে কথা বলতে পারি না। কেন জানি না। জানবার কোনো প্রয়োজন আছে বোধ করি না। জানবার কোনো প্রয়োজনই নেই। খেলা খেলে চলেছি। আপনার মনে আমি এগিয়ে যাই। কোথায় গিয়ে পৌঁছব বলতে পারি না সে কথা। শুধু জানি, শুধু দেখতে পাই এগিয়ে আমি চলেছি এখান থেকে ওখানে। ওখান থেকে সেখানে। আরো যে কোথায় সে কথা কেমন ক'রে বলব, সে কথা বলবার বোধহয় কোনো উপায় নেই। চলেছি আর চলেছি। এইটুকু শুধু জানি।

যে গল্প শুরু করেছিলাম সেই গল্প ধ'রেই এগিয়ে চলি। তারপরে পৌঁছে গেলাম গোয়ালন্দ। গোয়ালনন্দ নয় কিন্তু। কথাটা গোয়ালন্দ। সেখান থেকে একখানা বড় স্টিমারে যাত্রা পূর্ববঙ্গে। অনেকদূর চ'লে এসেছি পদ্মা নদীতে। স্টিমারে অথবা জাহাজে। আমি পাড়ি দিলাম পূর্ব বাংলায় আমাদের সেই মাটির দিকে।

এইদিকেই আমাদের দেশ। ভাগ্যকুল, নাগরনন্দী, কাইঠাপাড়া এই দিকে। সে যা হোক, আমি যাচ্ছি মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

কলকাতার থেকে সোজা চ'লে যাচ্ছি পূব দিক বরাবর। অনেক দূর অনে—ক দূর। কলকাতা থেকে একেবারে গোয়ালন্দ। এই দিকেই আমাদের দেশ। তবে এইবারে আমি যাচ্ছি মহাত্মা গান্ধীর কাছে। আর কোথাও নয়।

আমি শুনেছি, মহাত্মা গান্ধী না কি এই দিগড়ে চ'লে এসেছেন। আশ্চর্য মানুষ তিনি। বেশ আরামে থাকতে পারতেন। তা তো থাকবেন না। তিনি যে সকলের জন্য জীবন যাপন করেন। তোমার আমার মত নন তিনি। এই বৃদ্ধ বয়সে কী যেন কোন্ টানে পাড়ি দিয়েছেন একটা দেশ থেকে সুদূর আর একটা দেশে। কোনো প্রয়োজন ছিল না। খেয়েদেয়ে

ঘুমিয়ে দিন কাটাতে পারতেন। তা তো করবেন না। পাঁচজনের অথবা দশজনের অথবা সকলের সুখের জন্য বা আনন্দের জন্য সর্বদা এগিয়ে আসেন।

জীবনে তিনি ভুল করেননি তা তো বলছি না। হয়তো করেছেন। তা করলেও সকলের সেবার জন্য এগিয়ে চলতে সর্বদাই তিনি অগ্রগামী।

ভুল ক'রে থাকলে করেছেন অথবা তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি যে সত্যকে এবং কল্যাণকে সামনে রেখে এগিয়ে চ'লে যাচ্ছেন—সে কথা কে অস্বীকার করবে।

ভগবানের এক দুরন্ত শিশুর মত সর্বদাই তিনি অগ্রগামী। এই শান্তি-নিকেতনেও তাঁর একটি মূর্তি রয়েছে লাঠি হাতে বৃদ্ধ এগিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। কতদূরে কে জানে। কিন্তু সত্যের অভিমুখে তাঁর এ যাত্রা। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তিনি এই রকম গিয়েছিলেন।

তোমরা বলবে তিনি অনেকবার অনেকদিকে এগিয়ে গিয়েছেন। আমি দেখতে পাই, সর্বদাই তিনি সেই একের দিকে এগিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। তারপরে একদিন মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে দিল বাধা। সেই বাধা কি তাঁকে থামাতে পারল? তিনি থামলেন না। লাঠি হাতে তিনি এগিয়েই চললেন কোন্ সে দিকে? তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে।

আমিও এগিয়ে চলেছি ভারতের একটা দিক থেকে আর একটা দিক। গান্ধীজী চলেছিলেন তাঁর হিসাব মত। একটা দিক থেকে আমার চলাটা তাঁর চলার কাছে কিছুই নয়। তিনি হচ্ছেন এই পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে একটা মানুষের মত মানুষ। অনেকে তাঁকে পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ তা করে না। মোটের উপর এই পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই তাঁকে একজন অদ্ভুত মানুষ ব'লে স্বীকার করে। অনেকেই তাঁর গুণের গুণগ্রাহী।

আমি শুধু আজ নয়, আমার এই জীবনটা ভ'রেই গান্ধীজীর প্রসঙ্গ শুনে আসছি।

আমার তখন খুবই অল্প বয়েস। আমি আমার একটা খাতাতে আপন

মনে সব কবিতা লিখতুম। নানান ধরনের নানান কবিতা। সেই স্রোতের মধ্যে একটি কবিতা লিখলুম মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে।

আমার কাছে, আমার চারপাশে গান্ধীজীর প্রতিকূল সমালোচনাও কম হয়নি। এটা কেউ যেন মনে করবেন না, আমরা সবাই চিরটাকাল মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। তা নয়, এবং তা মোটেই নয়। মহাত্মা গান্ধীকে গালাগাল না দিয়ে জলগ্রহণ করতেন না এমন দু চারজন লোক আমাদের মধ্যে ছিল এবং তারপরেও আমার কাছে এসেছেন। এ সবই সত্য। তবু আমি ঠিক বলতে পারি না কি জানি কেন, মহাত্মা গান্ধীজীকে মনের ভিতরে অতিশয় ভালইবেসে ফেলেছিলাম।

পরবর্তীকালে আমার দিল্লীতে থাকাকালীন একটা সন্ধ্যায় যেদিন শুনতে পেলাম মহাত্মা গান্ধীকে রামলীলা Ground-এ এক আততায়ী গুলিবিদ্ধ করেছে—আমার যেন মনে হ'ল দিনের বেলাকার আকাশ কালো রঙে যেন ছেয়ে গেছে। তখন আমি নব যুবক। একটা বাড়ীতে একটি মেয়েকে গান শেখাচ্ছি। এই ঘটনা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম।

গান শেখানো বন্ধ ক'রে দিয়ে তারপর সাইকেলে আরোহী হয়ে লোদী রোডের দিকে যাত্রা করলুম। সেদিন বাস্ এই পর্যন্ত। Reaction বা প্রতিক্রিয়া ঘটল পরের দিন। পরের দিন টেবিলের কাছে চেয়ারে ব'সে আছি। হঠাৎ গান্ধীজীর কথা মনে ক'রে আমার মনটা কি রকম যেন হয়ে গেল। আমার এসে গেল কান্না, কান্না আর কান্না। গান্ধীজী আমার কে? আমার মত একটি ছেলে মহাত্মা গান্ধীর শোকে এ রকম ভাবে কাঁদে কেন। তারপরে অনেক কথা। দেখতে পেলাম, গান্ধীর শোকে সমস্ত নিউ দিল্লী শহরটাই যেন চঞ্চল এবং বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

আমার তো কেউ না। রাজনীতির সঙ্গে আমি তেমন একটা যুক্ত নই। গান্ধীজীর মতবাদকে আমি যে খুব একটা আঁকড়ে ধ'রে আছি সে রকম তো কিছু নয়।

তবু আমি কাঁদি। কার জন্য বা কিসের জন্য সে কথা ভাল ক'রে বলাও

শক্ত। আমি কাঁদি। এবং আমি কেঁদেছি। বারে বারে আমি কেঁদেছি। একটা সময়ে আনন্দময়ী মায়ের কাছে আমার অন্তরের একটা শোক যেন উথলে উঠত।

কেন, ঠিকমত সে কথা আজ আমি বলতে পারব না। হয়তো বা এমন হ'তে পারে পরম একটা আশ্চর্য বস্তুকে আমি চেয়ে ব'সে আছি। কি জন্য এবং কি ব্যাপার এ বলতেই পারব না। তবু বলছি, কাকে যেন আমি চাই। অথবা কী যেন আমি চাই। কোন্ সে জিনিস আমার জন্য রয়েছে—যাকে না পেয়ে আমি ঘুরে ঘুরে মরছি।

সেটা কি একটা বস্তু, না সেটা একটা প্রাণময় প্রাণী অথবা আর কিছু। আমি খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি খুঁজে খুঁজে ফিরছি। আমার এই অনুসন্ধান বোধকরি কখনো শেষ হবে না। আমার এই জীবনে আজ পর্যন্ত আমি এমন একজনকে দেখতে পেলাম না, যে ব্যক্তি আমার মনের কথাটা ঠিকমত বুঝতে পারে। সেই বুঝতে পারবার মত লোক আমি এখনো দেখিনি। দেখতে চাই বটে, কিন্তু দেখতে পাইনি।

কে কোথায় আছ জানি না। আমাকে বোঝবার মত কেউ কি আছ? অথবা নেই? আমি দিকে দিকে চারিদিকে ঘুরে বেড়াই আমার অন্তরের অথবা বাহিরের সেই বস্তুটিকে খুঁজে বের করার জন্য।

আমি চলেছি। আমি ঘুরছি। দিকে দিকে কত দিকে আমার যাত্রা। আমি খুঁজে বের করবই—আমার অন্তর যেন এই সংকল্প ক'রে ব'সে আছে।

সব কাজ করছি, সকল দিকে সকল খেয়াল রাখছি। কিন্তু আমার প্রাণের ভিতরে সেই এক কান্না। এখন যখন লেখা চলেছে তখনো তো তাই। অন্য কিছুই নয়। তবু দেখলেই দেখতে পাওয়া যায় আমার অন্তরের অভ্যন্তরে কত বড় একটা আগুন জ্বলছে। একটা যেন দাবদাহ। অথবা দেখতে পাচ্ছ কি, আমার অন্তর যেন একটি মরুভূমির প্রান্তর।

আমার যে এই অন্তর—সেটা বুঝি নিদারুণ এক ধূসর মরু প্রান্তর।

ধূসরও বটে, উষরও বটে। বড় বিচিত্র। বড় সুন্দর। বড় আশ্চর্য। বড় অপরূপ। অন্তত আমার কাছে অপরূপ।

কখনো কখনো আমি আমার অন্তরের দিকে ফিরে তাকাই। তখন বুঝতে পারি এমন অপরূপ দৃশ্য আর দেখিনি। আর ভাবি, এমন অঘটন আর বুঝি ঘটেনি। এমন একটা ব্যাপার আর কি কখনো কেউ টের পেয়েছে? অথবা উপলব্ধি করেছে?

আমি যত আমার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যাই ততই যেন আশ্চর্য এক সুন্দর বস্তুকে উপলব্ধি করি।

সুন্দর। অতি সুন্দর। অপরূপ। অতিশয় অপরূপ। বড়ই মনোরম। সুন্দর তো একেবারে যারপরনাই সুন্দর।

আমার মনের মাঝে এত যে খেলা সে কথা কে জেনেছে, আর কে জানবে। জানলে আমিই জানতাম। আর কারো তো জানবার কথাই নেই। সাধ্যও নেই, উপায়ও নেই। ব্যাপারখানা এই রকম।

এবারে আমি আমার সেই কথায় ফিরে যাই। মহাত্মাজীর কাছে কেমন ক'রে কোথায় গিয়েছিলাম। সে তো আরো আগের কথা।

তখন আমি কলকাতাতে থাকি। শুনতে পেলাম, মহাত্মা গান্ধী না কি পূর্ববঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন। দেশের মধ্যে দুই দলে না কি ঝগড়া বিবাদ হয়েছে। অনেক স্থলে তুমুল সব কাণ্ড হয়েছে এবং হচ্ছে। হচ্ছে তো আমার কি। আমার পরিষ্কার কথা, আমি না হিন্দু, না মুসলমান। না শিখ, না খ্রীষ্টান। আমি এ সব একদম কিছুই নই।

আমি তো টিকিধারী হিন্দু নই। না, একেবারেই নই। আবার আমি নই শিখ বা অন্য জাতি। কোনো দিকেই আমাকে টানা যায় না। কোনো পাশেই আমাকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে না। কোনো ভাবেই আমি পড়ব না। আমি যে তাঁর কাছেই আছি। কোথায়? বলি। সেই একটা জায়গায়—যেখান থেকে কেউ কোথাও প'ড়ে যেতে পারে না। যেখানে আর প'ড়ে যাওয়ার উপায়ই নেই।

বলতে পার একেবারে মাটিতেই আছি। তাই আর প'ড়ে যাব কোন্‌খানে।

নীচে বল নীচে আছি, উপরে বল উপরে। তবে নীচে বলাই ভাল। উপরে বললে অনেক ঝামেলা। নীচে বলতেই সুবিধা। এই দিকটাই আমি উপস্থিত গ্রহণ করলাম।

হয়তো আরো জায়গাতে বলেছি :—এখানে আবার বলছি, আমি একেবারেই হিন্দু নহি। নিজেকে হিন্দু ব'লে স্বীকার করতে আমার প্রাণ একেবারেই চায় না। বরঞ্চ আমার মনে হয়, আমি একজন নিতান্ত মানুষ। এর চেয়ে বেশী কিছুই নই, কমও কিছুই নই। ঠিক ঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারলেই আমার সব থেকে বেশী আত্মপ্রসাদ। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে হিন্দু বলতে আমার যেন ঘৃণা হয়। শত শত নিয়ম এবং আচারে জর্জরিত আমি আমাকে করতে চাই না।

ওই যে আকাশ সুনীল এবং সুন্দর—ওরই এক কোণে আমি যদি একটি স্থান পাই তাতেই আমার সুগভীর আনন্দ। হিন্দু ব'লে চিহ্নিত হ'লে তার শতাংশের একাংশও আনন্দ নেই।

আমায় যদি পাগল বল, তাতে আমার কিছুই ক্ষতি নেই। আমার আপত্তিও নেই। আমি শুধু এইখানে—আমার জীবন-কথার একটি পাতায়—একটি পৃষ্ঠায় আমার জীবনের সব থেকে উজ্জ্বল কথাটা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেলাম। আমি হিন্দু নহি, আমি মানুষ মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আরো কতগুলো কথা আসছে। সেই কথাগুলোও লিপিবদ্ধ ক'রে যাই।

আমি একজন মানুষ মাত্র। মানুষ, মানুষ, মানুষ। এর থেকে আর বেশী কিছুই না। চারটে হাতও আমার নেই। তিনটে চোখও আমার নেই। আরো অনেক কিছুই নেই। তবে প্রচলিত মানুষের যা যা থাকে আমার সে সব আছে।

তিনটে চোখ, তিনটে চোখ অনেক শুনেছি। কিন্তু আজ অবধি দেখতে পাইনি। স্বপ্নের দেখা নিয়ে মাতামাতি করবেই না। ও স্থলে যা ইচ্ছা

তাই হয়। কি হয় না সেটা বল। স্বপ্নের দেখাকে আমি একেবারে স্থানই দিই না।

কখনো কখনো—কচিৎ কখনো মানুষ স্বপ্ন দেখে আঁৎকে ওঠে। আবার অনেকে স্বপ্ন দেখে চ্যাঁচামিচি করে। স্বপ্নের ঘোরে কেউ কেউ পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটে। এই সব ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র কিছু বলবার নেই।

এবার আমি আমার জীবন-কথায় ফিরে আসি। সে কবেকার কথা। জানুয়ারী মাস। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গ করবার জন্য গান্ধীজীর কাছে এসে জুটেছি। সে কোথা থেকে কোথায়। কলকাতার থেকে একেবারে চাঁদপুর। গান্ধীজী যে পূর্ববঙ্গের দিকে সফরে বেরিয়েছেন। কোথায় গুজরাট আর কোথায় পূর্ববঙ্গ। গান্ধীজী তাঁর লাঠি নিয়ে একেবারে সেই পূর্ববঙ্গে।

আশ্চর্য মানুষ। আমি এর আগে একবার গান্ধীজীকে দেখেছি। একবার কেন দুবারও হ'তে পারে।

একবার গান্ধীজী এসেছিলেন আমার মামার বাড়ীর নিকটস্থ কুমোরটুলি অঞ্চলে না কোথায়। এই রকম ধরনের কথা আমি শুনেছি ব'লে মনে পড়ছে। আমার মা হয়তো তাঁকে দেখেছিলেন তখন। অন্তত পক্ষে আমার মামার বাড়ীর কেউ কেউ তাঁকে দেখেছিলেন—এ তো নিশ্চয়।

ঘটনাটা এই রকম শুনেছি, গান্ধীজী বিরাট একটা সমাবেশে বললেন, আমি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি। তোমরা সবাই আমাকে ভিক্ষা দাও।

সে বিরাট জনসমাবেশ। লোকে লোকে লোকারণ্য। গান্ধীজীর পক্ষ থেকে কাপড়ের একটি ঝোলা—বড় ঝোলা লোকের সামনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ভিক্ষার সামগ্রী সেই ঝোলাতে সংগৃহীত এবং বাহিত হচ্ছে।

তখন আর অন্য কোনো কথা নয়। আমরা ভিক্ষা করছি মানুষের কাছ থেকে মানুষেরই জন্য। অনেক ভিক্ষা সংগৃহীত হ'ল। তখন অবশ্য আমি নিতান্তই ছেলেমানুষ। আমি কিন্তু এই সব কাহিনী আমার মায়ের মুখে শুনেছি। সম্ভবত সেই সময়ে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাইনি। তবে এই সব কাহিনী আমি আমার মায়ের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছি।

সে সব কবেকার কথা। জন্মগ্রহণ করলেও আমার জ্ঞানবুদ্ধি তখন পর্যন্ত কিছু হয়নি।

এরপর হয়তো যখন আমি একটু বড় হয়েছি তখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই সময়কার কথাই বলি।

পরিচ্ছেদ—১২

আমার এই জীবন-কথাতে আমি ঝাঁ ক'রে অথবা ধাঁ ক'রে এদিক থেকে ওদিকে চ'লে যাই। কোনোরকম দৃক্‌পাত করি না। এই আমার এক রকমের স্বভাব। অন্যখানেও যা এইখানেও তাই। কথা নেই বার্তা নেই আমি চ'লে যাচ্ছি পুরোনো দিনের এক কাহিনীর মধ্যে। ঘটনাটা কি রকম বলি।

থাকি অথবা আছি আমার সেই পুরোনো দিনের আবাসস্থলে। ঠিকানা—৬৪ বি, জয় মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা। কাছের বড় রাস্তা যেখানে ট্রামলাইন, হচ্ছে গ্রে স্ট্রীট। আরো কাছে একেবারে প্রায় ধারেই নতুন এক প্রকাণ্ড রাস্তা অর্থাৎ কিনা খুব এক চওড়া পথ। নাম তার সেণ্ট্রাল এভিনিউ অথবা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। এখন কি রকম কি বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক খুব বড় সেই দরাজ রাস্তাটি আমাদের বাড়ীর সন্নিকটে।

বড় রাস্তা। আমাদের বাড়ীর নিকটে বড় সেই রাস্তার ওপারেই একটা গাছতলা বাঁধানো। সেইখানে একদিন দেখলাম এক সাধু ব'সে থাকে। মাত্র কৌপীন পরা। গায়ে আর কিছু নেই। সঙ্গে টুকটাক জিনিস-পত্র। খুবই যৎসামান্য।

অদ্ভুত সাধুই বটে। সেইবার সে বেশ অনেকদিন ছিল। আমরা কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সাধুর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতাম। সেইখানেই সে সাময়িক মত একটা আস্তানা গড়েছিল।

কথা তার আধো আধো। একটা তার দেবতা যেন ছিল। সেই দেবতাকে নিয়েই সে মহানন্দে বাস করত।

একটু বড় হয়ে উঠলাম। আমাদের বাড়ীতে আসতেন শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। আমার মেসোমশায়। আমার এক মাসী বিষ খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যতদূর মনে হয় তাঁর এই ঘটনার সাংসারিক কোনো কারণ ছিল। সে কারণ ঠিক মত আমি জানিও না। একটা কারণ তো নিশ্চয় ছিল।

আমার মেসোমশাই আমাদের বাড়ীতে খুব আসতেন, খুবই আসতেন। সেই কবে থেকে আসতেন। ক্বচিৎ কখনো আবার বড় মাসীমাও আসতেন। তাঁর কথাই এখানে বলছি। তাঁদের বাড়ির কোনো একটা পারিবারিক কারণে হয়তো এই ঘটনাটি ঘটল—আমার বড় মাসীমা সহসা আত্মহত্যা করলেন।

সেই মাসীমা—যাঁর নাম ছিল খাঁদি—দেখতে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। এই বিপর্যয় যখন ঘটল তখন আমাদের অনেকের জীবনে যেন একটা ওলোটপালট হয়ে গেল। হওয়ারই কথা।

সে মাসীমার কথা কিছুটা বলি। নাম ছিল তাঁর খাঁদি। মাসীমাও আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমি অথবা আমরাও ক্বচিৎ কখনো তাঁদের বাড়ীতে যেতাম না এমন নয়।

মেসোমশাই ওস্তাদী গান শিক্ষা করতেন। আবার আমাদের বড় বোন—যার নাম ছিল দুর্গা সেই দুর্গাকে গান শেখাতেন।

গান তো আমার বরাবরই ভাল লাগত। আমার বড় বোন দুর্গা যত না গান শিখেছিলেন আমি যেন তার চেয়ে বেশী মন দিয়ে গান শিখতাম। আমার বোন দুর্গা গান নিয়ে নিয়ে খাতাকে খাতা ভর্তি করতেন। আর আমি শুনে শুনেই গান অথবা গানের সুর আয়ত্ত ক'রে ফেলতাম কতকটা অন্তত।

আমার মেজ ভাই গান্ধীর গলা খুব মিষ্টি ছিল। লোকে ওর গান

বেশ মন দিয়ে শুনতো এবং প্রশংসা করতো। আমার মনে হ'ত, আমি কেন অত মিষ্ট ক'রে গাইতে পারি না।

সে সব দিন কোথায় চ'লে গেছে। গানের জগতে আমি খানিকটা স্থান ক'রে নিয়েছিলুম। এমন কি পরবর্তী যুগে দিল্লীতে এবং কলকাতায় গান শেখানোই আমার অর্থোপার্জনের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল। গান শিখিয়েছি আমি বহরমপুরে, নিউ দিল্লীতে এবং কলকাতায়। তখন কিন্তু আমি পয়সা নিয়ে গান শেখাতাম।

আর একটি কথা। গানের জগতে ঘুরতে ঘুরতে গান আমি শিখেছিলুম কয়েকজনের কাছে। মেসোমশাই গঙ্গাপ্রসাদবাবুর কাছে সামান্য কয়েকটা বছর। সেটা খেয়াল সঙ্গীত শেখা। আবার শিখেছিলুম বহরমপুরে ঠুংরী সামান্য কিছুকাল। ঠুংরী গানের প্রসঙ্গে আমার মনের মধ্যে কষ্ট রয়ে গেছে। বহরমপুরে আমি ঠুংরী শিখতাম সেই আমার হাবলদার কাছে। সেই হাবলদা বহরমপুরে বাস করতেন এবং ছিলেন বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক গিরিজাবাবুর ছাত্র। তাঁর কাছে অর্থাৎ সেই হাবলদার কাছে আমি যৎসামান্য ঠুংরী শিক্ষা করেছিলাম কয়েক মাস। কিন্তু অল্প শিখলেও আমার তিনি গানের অন্যতম গুরু, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা উল্লেখ করলুম তার একটু কারণ আছে। বহরমপুরে হাবলদার কাছে মাত্র কয়েকমাস গান শিক্ষা করেছিলাম। মেরেকেটে হয়তো বছর খানেক হবে কি না, এর বেশী নয়। বহরমপুরে সর্বশুদ্ধ বেশ কয়েকবার গিয়েছি। তার মধ্যে ওই একবার কয়েকটা মাস যাবৎ গান শিখেছিলাম। আমাদের হাবলদার কাছেই ঠুংরী শিক্ষা করি। অল্প হোক বেশী হোক, হাবল ঠাকুরের কাছেই শিখেছি। একটা দুঃখ আমার মনের মধ্যে বড় রকমের একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। সেটা পরবর্তী যুগে। সেই কাহিনীটিও এই বারেই ব'লে নেব।

দীর্ঘকাল পরের কথা। একদা কলকাতায় আমি আমার ঘরে ব'সে আছি। এমন সময় কোথা হ'তে যেন হাবলদা এসে হাজির। হাবলদা

এসে বললেন: অভয়দা—হাবলদা আমাকে এই নামেই ডাকতেন—অভয়দা, আমি আপনার কাছে এসেছি একটা বিশেষ বার্তা নিয়ে। আমার এই অসুখ, তা ছাড়া দৈন্য দশা। আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করুন।

হাবলদার মুখের ভাবে দীন অবস্থা পরিস্ফুট। মুখের ভাবে এবং পরিচ্ছদেও।

আমি কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। এইখানেই আমার পরাজয়। সামান্য কিছু টাকা, হয়তো দু চার দশ টাকা আমি হাবলদার হাতে দিতে পেরেছিলুম। কিছু আমার স্পষ্ট মনে নেই। তবে এটি আমার কাছে খুব স্পষ্ট যে, হাবলদার প্রয়োজনমতো আমি কিছুই করতে পারিনি।

তারপর? তারপর আর কি। হাবল ঠাকুর কবে যে দেহত্যাগ করেছেন তাও আমি বলতে পারি না।

এইভাবে আমার জীবনের গানের পর্ব কিছুটা বললাম। আরো কিছুটা আছে।

গান তো আমার জীবনে একটি প্রধান বস্তু হয়ে আছে সেই কতদিন থেকে। চিরদিন বললেই হয়। একেবারে চিরকাল। ছেলেবেলায় যখন দেখতুম আমার ভাই গান্ধী ছোটোমার কোলে উঠে সুন্দর গান গাইছে তখন আমি কি রকম যেন একটা কষ্ট অনুভব করতাম। আমার ছোটভাই গাইছে এবং মিষ্টি সুরে গাইছে—সেটা আমার পক্ষে কি রকম একটা দুঃখ অথবা বিষাদের সঞ্চার করত সে কথা বলতে পারব না। সেই মনে পড়ে, আমি মনে মনে ভাবতুম, আমার গান কেন তেমন ক'রে মানুষের মন স্পর্শ করে না।

কিছুই জানতুম না তখন। বুঝতুমও না। কিন্তু অন্তরে বেদনার অনুভব অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবে সারা জাগাত।

আমি বুঝতে পারি এই যে, জিনিসটা খুব একটা ভাল জিনিস নয়। তবু আমি ওই রকমই ভাবতুম।

আমার মেজ ভাই গান্ধীর কথা বলছি। গান্ধীকে ভালবাসতুম না তা নয়। খুবই ভালবাসতুম। মানুষের অন্তরের দিক দিয়ে যে সমস্ত বৃত্তি

থাকলে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় সে সমস্ত বৃত্তি আমার জীবনে বেশ খেলা করত। বরং বোধহয় তার উপরেও কিছু কিছু খেলা চলত। আজ এখন বুঝতে পারি এ সমস্ত দিক দিয়ে আমার দেহমনপ্রাণে অথবা আমার জীবনের মধ্যে কোনো কিছুই কমতি ছিল না। বরঞ্চ অনেকখানি বাড়তি বস্তু ঢেউ খেলত।

আমার জীবনে আমার দেহে মনে প্রাণে কী ছিল এবং কী ছিল না সেই কথা ভেবে আমি আর থই পাই না। একটা কথা বোধহয় বলেছি। বলেছি অথবা বলিনি। আমার বিধবা পিসীমা—যাকে আমি ইয়া পিসীমা বলতাম সেই পিসীমা হয়তো আমার পিঠে দু একটা পাখার বাড়ি বসিয়ে দিলেন। তারপরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা তিনি বলছেন, আমার কানে আসা মাত্র আমি দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়েছি। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি শুনছি পিসীমার সেই কথাগুলো। পিসীমা বলছেন আর অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। আমিও দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছি। আমি তখন নিতান্তই ছোটো। বয়স পাঁচ ছয়ের অধিক হবে না। পিসীমার ভাবের ধারার সঙ্গে আমার ভাবধারা মিশে একটা স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হয়েছে।

এই পিসীমার কথা আমি কেমন ক'রে প্রকাশ করব। পিসীমা হয়তো তাঁর শ্বশুর বাড়ী যাবেন। আমিও সঙ্গে যাবই। আমাকে কোলে ক'রে বিধবা পিসীমা চললেন তাঁর শ্বশুর বাড়ী। তাঁর শ্বশুরবাড়ী মানে সেই বাড়ী যেখানে আমার এক মামা থাকতেন—যার নাম সুকুমার মামা। তিনি একবার কাশীতে এসেছিলেন। অনেক কথা আমার সঙ্গে হয়েছিল। তিনিও সাধু হয়ে যাবেন এই রকম সব কথা।

আমি জানি, একটা কলেজের তিনি অধ্যাপক। আমার মামার বাড়ীতে তাঁর ছিল খুব যাতায়াত। এখন তিনি কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন সে খবর আমি জানি না। সে খবর আমি রাখি না ব'লেই হয়তো জানি না।

এবারে আমি বলব কাজী নজরুল ইসলামের কাহিনী। অক্রুর দত্ত

জেনে আমি গিয়েছিলাম আমার গলায় একটি রেকর্ড করতে। মা আনন্দ-ময়ীর একটি স্তোত্র গান, বাংলাতে আমি গেয়েছিলাম। দমদমে রেকর্ডিংও হয়েছিল। সেই রেকর্ড এখনো হয়তো বাজারে পাওয়া যেতে পারে। রেকর্ড অফিসে কাজী নজরুল ইসলামকে দেখতে পেয়েছিলাম। কয়েকটি মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন। তাঁর অন্তরের স্পন্দনে আমার প্রাণও স্পন্দিত হয়নি তা নয়।

সে সব অনেক দিনের কথা। দমদমে সে যাত্রায় কি কি হয়েছিল আমার ঠিক মত মনে নেই। তবে কাজী নজরুলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপে আমার গভীর একটা আত্মপ্রসাদ এসেছিল। সে বিষয়ে কথাই নেই।

এবারে আমি আসছি আর একজন মহাপুরুষের প্রসঙ্গে। স্বামী অভেদানন্দ। রামকৃষ্ণ জগতে ইনি কালী মহারাজ ব'লে পরিচিত এবং প্রচারিত। কালী মহারাজকে আমি জানি অনেক দিবস ধ'রে। আমার সেই শান্তদার গুরু তিনি, কত-না দিনের জানাশোনা।

আমি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে নীচের তলায় একখানি ঘরে শান্ত মহারাজের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন থাকতুম। উপরের তলায় থাকতেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কালী মহারাজ। অর্থাৎ কি না স্বামী অভেদানন্দ।

সেই কতদিনের কথা। কত যুগের তাও বলা মুস্কিল। আমি চ'লে গিয়েছিলুম মাতা আনন্দময়ীর সকাশে। মসূরী পাহাড়ের নিকটবর্তী দেরাদুন অঞ্চলে। সে কথা উল্লেখ করতে অসুবিধা আমার কিছুই নেই। তার কারণ আমি সত্যের পূজারী। আমার জীবনটাই সত্যের পূজার নামান্তর। এইটাই আমার সত্যিকারের পরিচয়।

কত কত ঝড় ঝাপটার শেষে—শত শত বাগ্‌বিতণ্ডার পরিণামে—অজস্র বৈচিত্র্যের অন্তে আমি যখন তাকাই আমি দেখতে পাই আমি যেন অন্তহীন আকাশের তলে পূজার ডালি নিয়ে পূজার জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছি। পূজা হয়নি, আমি এক বিস্তীর্ণ অপেক্ষায় রয়েছি—এটা যেমন সত্য, জীবনের স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে আমার পূজা হয়ে চলেছে—এটাও তেমন সত্য।

পূজা করিনি এটাও ঠিক, পূজায় মগ্ন আছি এটাও তেমনি ঠিক। তবে কি না পূজা আমার কখনো শেষ হয়ে যায়নি। চলেছে, চলেছে, জীবনের পূজা আমার চ'লেইছে। কবে যে অবসান তা বলতে পারি না।

তা ভাবছি অবসানের দরকার কি। এই যে ব'সে আছি—রৌদ্রালোকিত সবুজে ভরা এই যে প্রান্তর সেইটিকে সামনে রেখে এই যে আমার অবস্থান সেইটি কি শেষ কথা হ'তে পারে না। আমি হিন্দু কি মুসলমান অথবা আমি খ্রীশ্চান—এ সব কথা তো অনেক দিনই চুকে শেষ হয়ে গেছে। ও সব কথা আমার কাছে এখন নিতান্ত শিশুর বাক্যবিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়।

আমি ব'সে আছি আমার চোখে দেখা রাজত্বের সামনে, কানে শোনা বিচিত্র কলকাকলির নিকটে, আকাশ ভরা অপর্যাপ্ত রৌদ্রালোকের আদিবিহীন এবং অন্তবিহীন বিস্তারের সমীপে।

এখানে ভাবছি, আমি আমার ওই দিকটাকে একটু পরিষ্কার ক'রে নি। আমার অন্তরে বড় বড় অক্ষরে নির্মল একটি লিপি লেখা রয়েছে। এই লিপিটি যেমন সত্য তেমন উজ্জ্বল। সুন্দর কি না বলতে পারি না। হয়তো অনেকের কাছে তেমন সুন্দর না লাগতেও পারে। কিন্তু আমার কাছে নিজের সম্বন্ধে এ কথাটি সুন্দর এবং উজ্জ্বল।

কে কি বলবে, কে কি মনে করবে—এ সব আমার কাছে নিতান্ত শিশুর কাকলি। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই—আমি সেই একজনের অর্থাৎ শ্রীভগবানের তৈরী একটি মানুষ। আমি সেই তাঁরই একজন। আমার এ পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয় তেমন একটা সত্য পরিচয় নয়।

তবু আমি আমার জীবন-কথা ব'লে চলেছি। বলছি আর একজন লিখছে। মনে মনে ভাবছি, আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যতটা বলতে পারি ততটাই ভাল। এর মধ্যে একটা সুবিধে এই, আমি পারম্পর্য রেখে কিছু বলছি না। আমি বলছি আমার খুশি মত, অর্থাৎ কি না মনের মধ্যে যখন যে স্তরের কথা এসে পড়ে সেই অনুসারে ব'লে চলেছি। বর্তমান ক্ষণে অনুলেখন আমার চিরন্তনী মাতার। সে লিখছে,

আমি বলছি। আবার আমি বলছি, সে লিখছে। এইভাবে একদিকে লেখা আর একদিকে বলা—এই দুই পাখায় ভর ক'রে আমি সাঁতার কেটে চলেছি। এই সাঁতার আকাশে সাঁতার।

এটাকে আমি সাঁতার কাটাও বলতে পারি আবার সাঁতার কাটা না ব'লে সেতার বাজানোও বলতে পারি। সাঁতারই বলি অথবা সেতারই বলি কোনোটাতেই আপত্তি নেই। তবে দুটোতেই একটা তার আছে।

তারের কথায় একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। বহুকাল আগে, দিল্লীতে যখন থাকতুম মনোজ দাদার বাড়ীতে—খেতে ব'সে আমি বলতুম রান্নায় বেশ তার হয়েছে। তার হোক আর না হোক ওই কথাটা আমি প্রায়ই বলতাম। আসল কথা, ওই কথাটা বলতেই আমার একটা 'তার' অনুভব হোতো। তাই আমি ওই কথাটা বলতাম। বলতাম শুধু না, প্রায়ই বলতাম। রান্নায় তার থাকুক না থাকুক আমার বলবার মধ্যে তারটা যেন বুঝতে পারতুম। সেটা বেতারও নয় সেতারও নয়, সেটা আমার মনের মধ্যেকার তার।

এবার গৌরীমার কথায় আসি। আমার কাকা সম্পর্কে একজন—নাম কালাচাঁদ কাকা একদিন হঠাৎ এসে বললেন, বুঝলে বাপু, গৌরী মা রয়েছেন। এই বাগবাজারেতেই আছেন। ইচ্ছে করলে তোমরা কেউ স্বচ্ছন্দে তাঁকে দর্শন ক'রে আসতে পার। এ সব ব্যাপারে আমার নেচে ওঠা স্বভাব। অমনি গৌরীমার দর্শনে চললুম আমি। কেমন দেখেছিলুম, কি কি কথা হয়েছিল সে সব আর মনে কিছুই নেই। গৌরীমাকে দর্শন করেছিলুম এই কথাটা মনে আছে। তিনি তখন অতি বৃদ্ধা। কিন্তু বৃদ্ধা হ'লেও সোনার বরণ মূর্তি তাঁর। তপস্যায় অপরূপ সুন্দর দেহখানি তাঁর। আমার মনেতে একটা ছাপ দিয়েছিল।

প্রায় অস্পষ্ট একটি স্মৃতি। তবে আমি মনে মনে ভাবি, গৌরীমার ছবি অথবা মূর্তি আমাকে কেমন যেন একটি ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল।

আমি গৌরীমার জীবনী একখণ্ড কিনেছিলাম। মন দিয়ে পড়েছিলামও অনেকখানি। এমনকি সেই বই অবলম্বন ক'রে একটা গৌরীমাতার জীবনী

লিখতেও আরম্ভ করেছিলাম। গদ্যে না পদ্যে ঠিক মনে নেই। তবে কালাচাঁদ কাকাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমি যে গৌরীমাতার সূত্রে অনেকটা দূর এগিয়েছিলাম—এতে কিছু কথাই নেই। বৃদ্ধা গৌরীমায়ের মুখখানি আমার যেন মনে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তিনজন সাক্ষাৎ শিষ্যকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার মধ্যে গৌরীমাতাও একজন। এই কথাটা বলবার মধ্যে আমার একটি গৌরব বোধ আছে, সে তো নিশ্চয়। শ্রীরামকৃষ্ণ হোন বা তাঁর যে কোনো শিষ্য হোন—কোনো কথাই নেই। আবার শ্রীশ্রী-বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হোন বা তাঁর যে কোনো সাক্ষাৎ শিষ্য হোন সে বিষয়েও কোনো কথাই নেই।

আমি তো মনে করি আমি মহাপুরুষদের চরণের কাছে একেবারে ক্রীত অথবা বিক্রীত। আমার আর কোনো মূল্য নেই। আমি যে ওঁদের পায়ের কাছে রয়েছি অথবা থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছি—এইখানেই আমার জীবনের সঠিক মূল্যায়ন।

আর সকলই ধুলায় মিশে যাবে। আকাশে বাষ্প হয়ে যাবে কিন্তু থাকবে ওই কথাটি।

এবারে অন্য কথায় আসি। মহিমবাবুর কথা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহিমবাবু। একদিন মহিমবাবুর লেখা বই প'ড়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি শয্যাগত। রোগ ব্যাধি কা'কেও ছাড়ে না—এই কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসে।

মহিমবাবুর সঙ্গে কী যেন দুটো চারটে কথাও হয়েছিল। অনেকগুলো বই সংগ্রহ করেছিলাম—এ কথাও মনে পড়ছে আমার। আরো যেন মনে পড়ে বিলেতে বা বিদেশেতেও একবার যেন গিয়েছিলেন তিনি অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ কি না আমাদের মহীমবাবু।

রোগবালাই কা'কেও ছেড়ে কথা বলে না—এ কথা তো আগেই বলেছি। এই কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে আসে। শয্যাগত মহিমবাবুর প্রসঙ্গে আমার এই কথাটাই বারে বারে মনে জাগছে।

এবারে আসি স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের কথায়। তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আমার জীবনের আকাশে কিছুকালের জন্য উদিত হয়েছিলেন। যেমন এসেছিলেন তেমনই আবার তিনি কোথাকার জিনিস কোথায় চ'লে গেলেন। হয়তো বা যেখান থেকে এসেছিলেন সেইখানেই চ'লে গিয়েছেন।

আমার জীবনের আকাশে শিবানন্দ গিরিজী মহারাজ একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদার্থ। তাঁর কথা যতই মনে পড়ে ততই আমি যেন অবাক হয়ে যাই। আমি যেন এরকম একটা অত্যাশ্চর্য চরিত্রের ব্যক্তি কোথাও বড় একটা দেখতেই পাইনি।

কোন্‌খান থেকে কেমন ক'রে তিনি যে আমার জীবনের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা আমি বলতে পারব না।

ভুল ত্রুটি কি মানুষের নেই। ভুল ত্রুটি মানুষের আছে। ছিল, আছে এবং থাকবেও। তবু বলছি, এমনতর একজন মানবদেহধারী আমার তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র জীবনখানিতে এসে পৌঁছেছিলেন। এ তো একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা। এ আমি দেখেছি এবং আমার জীবনে বিস্ময়ের পরে বিস্ময় এখানেই।

স্বামী শিবানন্দ গিরিজী মহারাজ শুধু যে আমার জীবনের মাঝখানে এসে পড়েছিলেন তা নয়। আমার লেখা গানগুলোর মস্ত এক সমঝ্‌দার ছিলেন তিনি। কতগুলো আমার লেখা গান তিনি সুর দিয়ে গাইতেনও। সে সব সুরও হেলাফেলা করবার মত নয়।

আবার বেশ সুন্দর খোল বাজাতেও তিনি পারতেন। আমি একবার তাঁর সঙ্গত শুনে অবাক না মেনে পারিনি। অন্যান্য দিক বাদ দিলেও তাঁর কাছে পেতাম একটা আন্তরিকতার স্পর্শ। যেখানে সেখানে সেই স্পর্শ আমাকে যেন স্পর্শ করত।

আমার এই খাঁচার জন্মদিবসে প্রত্যেকবারই তিনি আমার কাছে অবশ্যই আসতেন। এটা আমি ইদানীং কালে দেখেছি। একবার একটা সুন্দর পকেট ঘড়ি আমাকে উপহার দিলেন। জন্মদিনের উপহার। সেই

ঘড়িটা অদ্যাপি আমার কাছে রয়েছে এবং বলছে, টিক টিক ঠিক ঠিক। ঘড়ির কথা আমরা অনেক সময় শুনি না। কিন্তু শুনলে কাজ দিত।

তারপরে আসছে আমাদের সবাইকার পরিচিত শ্রীযুক্তরাম সিং তোমরজীর কাহিনী। সেই যে আমি শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম সেই সময় থেকেই তোমরজীর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার সঙ্গে তোমরজীর প্রথম পরিচয় সেই তখনই অর্থাৎ ১৯৮২ সালের কোন্ সময়ে যেন।

কলকাতা থেকে আমি হঠাৎ শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম। উদ্দেশ্য কসবা গমন।

তারপরে কতবার তো কসবায় গিয়েছি। এ কসবা কিন্তু কলকাতার নিকটবর্তী কসবা নয়। কলকাতার কাছে যেমন কসবা আছে এখানেও রয়েছে আরো একটি কসবা। সেখানকার সেই কসবাতে যেমন আমি গিয়েছি এখানকার সেই কসবাতেও তেমন আমি এসেছি অনেকবার।

এখানকার কসবাতেও কতবার আমি আনন্দে কাল কাটিয়ে গিয়েছি। এখানকার কসবাতে আমার সঙ্গী ছিল প্রধানত বিশ্বনাথ। পরবর্তীকালে সে আছে পশ্চিম দিনাজপুরে। তার কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি আমি।

প্রায় সব চিঠিতে থাকত তার লেখা কবিতা। কবিতার পরে কবিতা। সব কবিতাই যে সর্বাঙ্গসুন্দর সে কথা বলতে পারি না। তবু দেখতে পাই বিশ্বনাথ পাতার পরে পাতা ভরিয়ে কবিতার ডালি সাজিয়ে তুলত।

সে কি একটা আধটা কবিতা। সে অনেক কবিতা। তার প্রাণে ফুল ফোটার মত ফুটেছিল, কত কত কবিতা। সমস্ত কবিতাই লেখা তাঁর গুরুজীকে ঘিরে।

যেখানে যত গান লেখা হয়েছে, কবিতা ফুটে উঠেছে সমস্তই সেই এক-জনের পায়ের কাছে রাখা রয়েছে, রাখা থাক্।

কসবা গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। কসবার সেই অভিরাম আমাকে কত গান শোনাতো। গানের পরে গান। গানের মধ্যে একটু গ্রাম্য

টান যেন থাকত। তবু সেই গান আমাকে যেন আকর্ষণ করত। আমি অন্তর দিয়ে সেই গান শুনতাম।

পরিচ্ছেদ—১৩

এবারে আমি আসছি আমার আর এক কাহিনীর মধ্যে। Palm Avenueর বাড়ীতে যখন আমি এসে ছিলাম কিছুদিন সেই তখনকার কথা।

সে কি আজকের কথা? আমি যখন দীর্ঘ প্রবাসের পরে কলকাতায় এসে কিছুকাল কাটাচ্ছি সেই তখনকার কথা বলছি। সালটা হয়তো উনিশ শো পঞ্চাশ অথবা তার নিকটবর্তী কোনো এক সময়। তখন রয়েছি Palm Avenue তে মুক্তালয় নামক গৃহে। সেই পাড়াটাতে মুসলমানদের অধিক বসবাস ছিল।

মুসলমানদের কথা উঠেছে। কেউ যেন না ভাবেন মুসলমানদের আমি একটু অন্য চোক্ষে দেখি। সে সম্বন্ধে আমি পরিষ্কার জানাই যে, আমার কাছে হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, ইহুদী ইত্যাদি সকলেই একই রকম।

সবাই তো মানুষ। সবাই তো একই রকমের মানুষ। এর মধ্যে কারোর গা কাটলে হলদে রক্ত বেরোবে না। আবার কারোর গা কাটলে যে সবুজ রক্ত বেরোবে তাও নয়। আমরা সকলেই মানুষ আর মানুষ। আমাদের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবু আমরা সকলেই মানুষ। মানুষ ভিন্ন কিছুই নই।

Palm Avenue তে বাস করছি সম্ভবত বালীগঞ্জের আনন্দময়ীর আশ্রমে অল্প সময় থাকার পর।

আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে কিছুকাল আমার কেটেছিল মাঝখানে। তারপরে আমি এই Palm Avenue-তে একটি ঘর ভাড়া করলাম। সেখানে আমি থাকতে শুরু করলাম আমার ধর্মপত্নী যমুনার সঙ্গে।

সেখানেই আমার প্রথম পরিচয় হয় আমাদের নমিতা দেবীর সঙ্গে। এক-খানি বাড়ির মধ্যেই কয়েকঘর ভাড়াটিয়া বাস করেন। নমিতা দেবীও থাকতেন সেখানে একখানা ঘরে। আমরা আমাদের মত একখানা ঘর নিয়ে বসবাস করতে শুরু করি।

বলছি ওই পাড়াটা তখন মুসলমানদের পাড়া। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে রাত্রিবেলায় কোনো কোনো দিন কানে আসত মুসলমানদের গানপর্ব। তাঁরাও সমবেত হয়ে রাত্রিকালে আধ্যাত্মিক গান সুন্দরভাবে গাইতেন। সেই গানের স্মৃতি আমার মনে এখনও স্পষ্টভাবে মুদ্রিত রয়েছে।

তখনো কিন্তু হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগাভাগি হয়নি। মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের তখনো বেশ সম্প্রীতি। যাদের মনে সম্প্রীতি নেই তাদের কথা উল্লেখ করতে চাই না। তার কারণ তাতে ক'রে আমাদের কারো কোনো প্রকার উপকার দর্শাবে না। ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ওই দিক দিয়ে আমি যেতেই চাই না। বরং যেভাবে লিখছি সেভাবের ভিতর দিয়ে যদি আমার অন্তরটিকে সুন্দরভাবে এবং পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে যেতে পারি তবেই পাঁচজনের অধিক কল্যাণ। আর তাতে ক'রে সত্যের মর্যাদাও রক্ষা করা হবে অনেক বেশী।

সত্যের খাতিরেই বলছি, আমার এই পুস্তকখানি লিখতে গিয়ে আমি যেন সত্যের অমর্যাদা না ক'রে বসি। আমি যেমন মানুষ তেমনটাই সকলের সামনে তুলে ধরব। তবেই আমার আসবে অন্তরের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি।

এরপরে আমি আসব আসানসোলের দিকে আমার কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে। যতদূর আমার মনে এসে যায় রেখে যাচ্ছি।

কয়েকবার হয়তো আমি গিয়েছিলাম। সে তো অনেক কালের কথা। আসানসোল ব'লে নয়, দুমদাম এরকম আমি কত জায়গাতেই চ'লে যেতাম। হাতে যাওয়ার মত টাকা থাকলেই হ'ল। বাস্। আমি রওনা হয়ে গিয়েছি। আর কোনো কথাই নেই।

আসানসোল গিয়ে আমাদের লীনা মায়ের বাড়িতে উঠেছি। ঠিকমত

কিছু মনে পড়ছে না। কত বার কত জায়গায় যে গিয়েছি তার কোনো লেখা জোখা নাই।

আমি যেন এক যাযাবর, আমি যেন এক পথের মানুষ।

বাস্তবিকই চিরকাল আমি পথেরই পথিক। এক জায়গাকার মানুষ তো আমি নই। আমার অন্তর্যামী আমাকে কেবল ঘোরাচ্ছেন। ঘুরি, ঘুরি আর আমি ঘুরি। চিরকালই ঘুরে বেড়াই। কোথাও থিতু হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে আমি থাকতে পারিনি। কোনোখানে বাসা বাঁধা এবং নিশ্চিন্ত হওয়া আমার কপালেই নেই।

সত্যি কথা বলতে কি আমি হচ্ছি চিরকালের এক যাযাবর। আমার পথে আমি চলেছি আর চলেছি। আমার একজন নিত্য সঙ্গী আছে। সে আমি নিজেই। অথবা সে আমার চিরকালের বন্ধু।

তিনি আমার ভগবান। এই কথাটাই ঠিক মত কথা। সেই ভগবান অথবা সেই ঈশ্বর, অথবা সেই ঠাকুর ছায়ার মত আমার সঙ্গী হয়ে রয়েছেন। তিনি আমার ছায়া না আমি তাঁর ছায়া এই কথা হলফ্ ক'রে কে বলবে।

এই কথা বলবার কোনো উপায় নেই। উপায় বাস্তবিকই নেই। আমরা সেই চলেছি কবের থেকে কোথায়। আমিও চলেছি, সেও চলেছে। সেও চলেছে আমিও চলেছি। সেই লোকটাই যে আমি। আমি ব্যক্তিটাই যে সে।

চিরন্তন সেই স্বভাব। তাঁর কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো গত্যন্তর দেখছি না।

সেই আসানসোলের কথা। আমি লীনার কাছে কতবার গিয়েছি। তা আর কিছু আমার মনেই পড়ছে না। এখন যে শান্তিনিকেতনে ব'সে ব'সে লিখছি অথবা লেখাচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছি একজন অনাদি অনন্ত পুরুষ তাঁর কাজ ক'রে চলেছেন।

এই কিছুক্ষণ আগে আমার হাতে লীনা মায়ের একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিরন্তনীকে লেখা লীনার চিঠি। ছোট্ট এক টুকরো চিঠি।

একখানি পোস্টকার্ড লীনা লিখেছে, যাওয়া ও আসা এক অদ্ভুত প্রেরণায় হ'ল। আসার বিবরণ চিঠিতে দেব না। সে এক অপূর্ব ঘটনা। বাবা সঙ্গেই ছিলেন। ············আসার ঘটনা বিস্তারিত লিখে রাখছি। এর copy তোমাকে পরে পাঠাব। বাবাকে শুনিও।

এখনও স্বর্গের ঘোরে আছি। এ ঘোর যেন কোনো দিন না কাটে।

তোমার গোপাল (বাবা) কি বলেন? গোপাল এবার আমাকেও ভীষণভাবে টানছেন। জানি না যে কোনো সময় তোমাদের ওখানে হাজির হ'তে পারি ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতনে এসে আমি প্রথম অনেকদিন কাটিয়েছিলাম মদন-গোপাল পালের বাড়ীতে।

মদনবাবার সাদাসিধে সহজ সরল স্বভাব আমাকে যেন তাঁর বাড়ীতে ডেকে নিল অথবা টেনে নিল।

তখন এই ভুবনডাঙ্গা অঞ্চলে বড় রাস্তার উপরে মাঝারি সাইজের একটি দোকান তাঁর। যতদূর মনে পড়ে তখন ছিল মুদির দোকান।

মদনবাবা ব'লেই আমি ডাকতাম তাঁকে। যেমন তিনি তেমন তাঁর সহধর্মিণী বিশ্বেশ্বরী দেবী। দুজনের আন্তরিকতায় আমি তখন তাঁদের কাছে পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছি।

আমার একটা অভ্যাস ছিল সকলের সকল ঘরে আমি ঢুকতামই না। তাই সামনেই যে ঘরখানা—দোকান ঘরে অথবা দোকানের পাশ্ববর্তী ঘরে আমি রইলাম।

ক্বচিৎ কখনো বাড়ীর দোতলায় উঠেছি বটে, কিন্তু আমি থাকতাম নীচেকার দোকান ঘরের মধ্যেই।

এই রকম চলতে চলতে একদিন দেখি একজন সাদা চামড়ার মহিলা এসে দোকানেতে একখানা চেয়ারে ব'সে আছেন। শুনলাম তাঁর নাম এটা ঘোষ। পরে আমি তাঁকে এটা মা ব'লেই ডাকতাম। একটি ভদ্রলোক ছিলেন শান্তিনিকেতনের মানুষ। তিনি রস ক'রে বলতেন, এটা ওটা সেটা। তাঁর নাম ছিল বি. এম. সেন। তিনিও থাকতেন শান্তিনিকেতনেই।

বি. এম. সেন মশাই আশ্চর্য এক মানুষ ছিলেন। তাঁর একটি গাড়ী ছিল। মোটর-চালিত যান। সেই গাড়ীতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল নিয়ে প্রায়ই তিনি ঘুরে বেড়াতেন শান্তিনিকেতনের পথে পথে।

সে এক অভিনব দৃশ্য। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কলকোলাহলে মুখর তাঁর গাড়ীটিকে প্রায়ই দেখা যেত এই শান্তিনিকেতনেরই রাস্তায়। বি. এম. সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমিও ঘুরে বেড়াইনি তা নয়।

মদনবাবুর বাড়ী থেকে আমি এসে প্রবেশ করলাম এই শান্তিনিকেতনে।

এর পূর্বে আমি যে এখানকার কসবা গ্রামে কিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছি—সে কথা হয়তো আগেই বলেছি। কসবা গ্রাম থেকেই মদনবাবু আমাকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে।

তারপরে আসছে আর একজনের কথা। তাঁর নাম প্রফুল্ল দেবী ঘোষ। তাঁর শৈশব কেটেছিল বারাণসী ধামে অর্থাৎ কাশীতে। জন্ম কাশীতে কি না সে কথা বলতে পারছি না। তিনি অনেক মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানুষ ছিলেন। এটা আমি বুঝতে পেরেছি।

তবে তাঁর জীবনের শেষ অংশে আমি তাঁর দিকে বেশী নজর দিতে পারিনি। এটা আমার একটা দুঃখ।

এই শান্তিনিকেতনেই তিনি আমার কাছে প্রথম এলেন। কী আশ্চর্য, প্রথম আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন আমারই এক ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

আমি তাঁকে ডাকতাম নীরাজনা মা ব'লে। তাঁকে অনেকগুলো চিঠিও লিখেছিলাম। তাঁর লেখা একখানি পুস্তক অথবা পুস্তিকা বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল আমাকেই নিয়ে। ছোট্ট একখানি বই। তাতে আমার সম্বন্ধেই কিছু কিছু কথা। বইখানার নাম শ্রীঅভয় প্রসঙ্গ। বইখানি বেশ ভালই লিখেছিলেন তিনি। এই খাঁচাটার সম্বন্ধে কিছু সব কথা। তাঁর লেখা সব কথা তাঁরই ভাবের সব কথা। যেমন ইচ্ছা তিনি লিখেছেন। সকল কথাই তাঁর প্রাণ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাই বলছি, তাঁর প্রাণের কত সব কথা।

ছোট্ট পুস্তিকা বটে, এখনো এক আধ কপি কারো কারো কাছে রয়েছে।

যেমন, চিরন্তনীর কাছেও একখানি রয়েছে। হয়তো আমাদের মধ্যেই কারো কারো কাছে পাওয়া যেতে পারে।

বইখানি তাঁরই লেখা। আমার নীরাজনা মায়েরই লেখা। অনেক সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। আমি কোথাও গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। আমি নিজেই লিখছি বটে, তবে এ সব কথা তো আমার লেখবার কথা নয়। এই রকম স্থলে অন্যেরাই সাধারণত লিখে থাকেন।

আমি তো আজন্মই এক আকাশবিহারী পক্ষীর মতো। অথবা এক বিরাট জলাশয়ে যেন একটি মাছ। মাছ যেমন যথেচ্ছ খেলে বেড়ায় অথবা ঘুরে বেড়ায় আমিও তেমনি ক'রে থাকি। বিশ্বগাঙে আমি যেন সাঁতার কেটে বেড়িয়ে বেড়াই।

আমি উড়ি অথবা সাঁতার কাটি—এ কথা তেমন ভাল ক'রে বলতে পারব না। আমি উড়ে বেড়াই তাও বটে, আমি আবার সাঁতার কাটি এ কথাও ঠিক। আমি যখন যেমন ধারা চলি তখন আমার তেমন ধারা। এই কথাটাই আমার পক্ষে একেবারে লাগসই কথা।

প্রফুল্ল মা থাকতেন শান্তিনিকেতনেতেই। যতদূর শুনেছি প্রফুল্ল মা কাশীবাসী ছিলেন শান্তিনিকেতনে আসার পূর্বে। আমি জেনেছি, সেই সময়ে তিনি কাশীতেই অনেকদিন কাটিয়েছেন। আমার নিকটে আসাটা এবং অনেকদিন আমার সাথে সাথে ঘোরাটা—এই সবটাই তাঁর জীবনে একটা বিশেষ পর্যায়ভুক্ত। আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রফুল্ল মা তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু বিষয়েই অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন—এটা আমি যেন দেখতে পেয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি। তিনি বেশ লেখাপড়া জানতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল। আমার তিনি এত কাছে এসে পড়েছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছু একপাশে রেখে অনেক সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতেন। এই ঘটনাটি এমন একটা বিষয় যে এ সব গল্প নিজের কলমে লেখা অথবা নিজের মুখে বলা খুবই অস্থবিধাজনক মনে হয়। কিন্তু উপায় নেই। ব্যাপার যে এই রকমই।

তাঁর জীবনের সব কথা সকলে জানেনা। জানা তো সম্ভবই নয়। তাঁর জীবনের শেষ দিকে অথবা শেষের দিকের কাছাকাছি একবার তিনি চ'লে গেলেন নাগপুরে। তাঁর বড় ছেলের কাছে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নাগপুরে দেখতে পেলাম তাঁর বড় ছেলে Caltex সরবরাহ বিভাগের একজন বিশেষ বড় চাকুরে। চাকুরে শব্দটা বলছি বটে কিন্তু আর তো কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। মোটের উপর কথা এই তাঁর হাত দিয়েই সেখানে সর্বত্র Caltex সরবরাহ হয়, অন্তত তখন।

একটি বৃহৎ অট্টালিকাব দোতলার উপরে আমার থাকার স্থান হ'ল। ব্যবস্থা এবং স্থান দুটোই দেখতে পেলাম চমৎকার। দোতলার উপরে সেখানে নিজের আনন্দে নিজে থাকতাম। কতদিন ছিলাম ঠিকমত আর মনে নেই। সেবারে আর বম্বে যাওয়া হয়নি। নাগপুরে কিছুদিন কাটিয়ে আমরা কলকাতাতে ফিরলাম। তারপরে কিছু সময়ের মধ্যে নীরাজনা মায়ের বড় রকমের অসুখ হ'ল। তাঁর জীবনের শেষভাগে আমি মা আনন্দময়ীর সঙ্গে অনেক অনেক দূরে চ'লে গিয়েছি। দূরে—বহু দূরে একেবারে হরিদ্বারে আবার দেরাদুনে।

সেই সময়ে দূরের থেকেই শুনতে পেলাম অথবা চিঠিতে জানতে পারলাম নীরাজনা মায়ের দেহাবসান হয়েছে। নীরাজনা মায়ের কথা যতই ভাবি ততই মনে মনে আমি যেন অবাক হয়ে যাই। এত অল্প দিনের সাহচর্যে এত বিশাল পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা আমার জীবনকে যেন কানায় কানায় ভ'রে দিয়েছিল। অথবা ভ'রে তুলেছিল। নামটা তাঁর ছিল প্রফুল্ল দেবী ঘোষ। তিনি আমার জীবনে হঠাৎ ক'রে যেমন এসেছিলেন তেমনই চ'লে গেলেন কোথায় কে জানে।

শান্তিনিকেতনের কথা বলছিলুম। শান্তিনিকেতনেই তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাস করতেন। আমি তাঁকে দেখেছি। কিন্তু নামটা তাঁর এখন আর আমার মনে নেই। নীরাজনা দেবীর দুই কন্যা এবং দুই পুত্র আমাদের মধ্যে অনেকের কাছেই পরিচিত। এক কন্যা কলিকাতায় হাইকোর্টে কাজ করেন, সম্ভবত এখনো। আমি খোলাখুলিই বলছি, আমার আত্ম-

জীবনী লেখবার শখ আছে কিন্তু এতসব ঘটনা মনে রাখবার মত ক্ষমতা নেই। যাকে বলে মুরোদ তাও নেই। তবু যতটা পারি লিখি অথবা লেখাই। কারণটা এই, এখন অর্থাৎ আমার জীবনের প্রান্তভাগে এই কাজেই আমি একটু মন দিয়েছি। আর তো বেশী কিছু পারি না। এই কাজটিই ক'রে যাই আমার সাধ্যমত। এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ নীরাজনা মায়ের প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে এই কথাটাই আমার মনে বিশেষ ক'রে জাগরূক হচ্ছে যে, আমার জীবনে যারা যারা অন্তর হ'তে আমাকে ভালবেসেছিল তারা অনেকেই চলার পথে, চ'লে যাওয়ার দিকে। যে দু চার জন বাকী আছে তাদের কথাও যে মনে আসে না তা নয়। তবে এই কথাটাই আমার জীবনের পরম এবং চরম কথা—কেউ আমার নয় অথচ সকলেই একান্তই আমার।

এইটাইতো আমার জীবনের চরম সত্য কথা। কেউ আমার নয় অথচ সকলেই একান্তভাবে আমার আপনার। এই যে বললুম—এর মধ্যে একটুকুও অত্যুক্তি নেই। আমার প্রাণের কথাই এই। এবং এই কথার উপরেই আমার যত গৌরব-বোধ। এখানেই আমি খুশী।

পরিচ্ছেদ—১৪

আমি বামুনের ছেলে। পূজারী ব্রাহ্মণের গুষ্টি আমরা। লক্ষ্মীপূজো করা—বাড়ী বাড়ী লক্ষ্মীপূজো ক'রে বেড়ানো আমাদের পক্ষে যে বিসদৃশ ব্যাপার তা মোটেই নয়। অন্তত এই রকমই ছিল। তবে আমার অন্তরের কথাটা জানাচ্ছি।

লক্ষ্মীপূজো—in the real sense of the term—এদেশে আমাদের মধ্যে খুব কমই ঘটে। কোথায় লক্ষ্মী আর তাঁর পুজো। আমি দেখতে পাই আমার ক্ষীণ চোক্ষে হ'লেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, কোথায় বা লক্ষ্মী আর কোথায় বা তাঁর পুজো। কিছু না মশাই কিছু না। কই, কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না।

লক্ষ্মীপূজোতে কী লাগে। লাগে অনেক কিছুই। তার মধ্যে প্রধান তিনটি ফুল। এই তিনটি ফুলেই বেশ ভালো রকম লক্ষ্মীপুজো সংসাধিত হয়ে থাকে। ওই তিনটি ফুল কি কি? আমি একেবারে অতি উচ্চস্বরে ঘোষণা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি—পরিশ্রম, বুদ্ধি এবং সততা—এই তিনটিই লক্ষ্মীপূজোর জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ ফুল। অন্য সব কিছু না হ'লেও চলতে পারে। কিন্তু এই তিনটে ফুল একেবারে অত্যন্ত রকমের প্রয়োজন। প্রথম ফুল হচ্ছে পরিশ্রম। পরিশ্রমে বিমুখ হ'লে কোনো মতেই চলবে না। তার সঙ্গে চাই একটুখানি বুদ্ধি। বুদ্ধি ব্যতীত কোনোভাবেই, কোনোমতেই, কোনোদিকেই একটি পা-ও এগোতে পারবে না। যা কিছু কাজ করবে তার মধ্যেই বুদ্ধিকে রাখতে হবে জাগ্রত ক'রে।

আর একটি জিনিস—সততা। সততা গেল তো সব গেল। সততাই যে ভিত্তি। ভিত্তি শুধু নয় ভিত্তিভূমি। এইভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে চ'লে যেতে হবে এই তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে। একটাও একটু ঢিলে ক'রে দিলে চলবে না।

এখানে লক্ষ্মীপূজোর কথা বলছি। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই ওই একই কথা। ধর, আমেরিকায়। আমেরিকাতে এত ঐশ্বর্য কোন্‌খান থেকে আসে। কোন্‌খান থেকে এসেছে। আমেরিকাতে এই তিনটি জিনিসেরই প্রাচুর্য। তাই সেখানে ঐশ্বর্যও অধিক। কমতি কোন্‌টার। স্বামী বিবেকানন্দ এই আমেরিকাতে এদেশের সেই প্রাচীন ধর্মের জয়ডংকা বাজিয়েছিলেন। সেই কত যুগ আগে। তাঁর জোরটা ছিল কোথায়। তাঁর জোরটা ছিল সত্যের জোর—সততার জোর। আর তার সঙ্গে ঐশ্বর্য গভীরতার এবং আন্তরিকতার।

এবারে আর একটি বিষয় নিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছি। এই যে আমাদের দেশে কথা চ'লে আসছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারটে যুগের কাহিনী—এই চারটে কথাই তো চিন্তা করবার মতো বিশেষ কথা।

আমরা শুনতে পাই, এর পিছনে কত শত গল্প কাহিনী। যাকে বলে legend. Legend ছাড়া আর কি বলব। অবশ্য এ কথা ঠিক, এসব

গল্পের অথবা গল্প কাহিনীর ভিতর দিয়েও অনেক কিছু শিক্ষার বস্তু আছে। তবু বলি, বস্তুগুলিকে যথাযথরূপে রাখলেই সত্যের মর্যাদা ঠিক থাকে। এতে ক'রে অল্প বয়স্ক বালকদের মনও ঠিক পথেই চলে। মিথ্যার কালিমাতে আচ্ছন্ন হয় না, অথবা কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় না।

যখন যে-দেশে যে-ভাবটি চলতে থাকে অথবা খেলতে থাকে তখন সেই ভাবেরই জয় জয়কার সেখানে। বর্তমানে যে রকম যুগটা পড়েছে তাতে ও রকম ধরনের গল্প কথায় আর কাজ চলে না। আর তা ছাড়া আমার কাছে তো ও সব আজগুবি ধরনের বস্তুর তেমন কোনো মূল্য নেই। মূল্য ততটুকুই আছে যতটুকু ঠিক ঠিক। বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে হয়তো অনেকগুলো কথা বলতেই হয়। একটা গাছকে আঁকতে গেলে তার সঙ্গে অনেকগুলো পাতার অবতারণা করতেই হয়।

আমি আমার ডায়েরী অনুসারে জীবন-কথা লিখতে গিয়ে ভাবছি এখন কি লিখি। লেখবার মতো কথা কিছু কম নেই। অনেকে আমার কাছে নিজের নিজের মত কিছু কিছু সম্ভার নিয়ে আসেন না তা নয়। এই রকম লিখলে ভাল হয়। ও কথাটা ও রকম ধাঁজে লিখলেই বোধকরি ঠিকটি হয় এই সব।

আমি তো এক পাগল। লোকের তালে তাল দিয়ে চলব ততক্ষণ— যতক্ষণ আমার তাল বজায় থাকে। নইলে পরে আমি নারাজ। আমি তো আমার কথাই বলছি। অন্যের কথা তো বলছি না।

তবু—তবু আমি বলি, আমি যে বিশ্বের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে গিয়েছি। অথবা আমি যে দেখতে পেয়েছি, আমি বিশ্বের সঙ্গে এক হয়েই আছি। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এবং বিশ্বের সকল স্থলে নিজেকেই আমি দেখতে পাই। আমার বিস্তারটা ওরকম ভাবে সকল দিশাতে ছড়িয়ে পড়ল কি ক'রে। না, ছড়িয়ে তো কিছু পড়েনি। ছড়িয়েই তো রয়েছে সে। যেমন ছড়িয়ে তেমন ছিটিয়ে—যেমন বিস্তারে বিচিত্র তেমন আলোকে আলোকে আলোকময়।

কী যে হয়েছে তা বলাটাই মুশকিল একেবারে। আমার মন বলে,

সকল সুন্দরকে নিয়ে এবং সকল অসুন্দরকে নিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি এবং যা কিছু সমস্তকে চোখ মেলে পর্যবেক্ষণ করছি।

যা কিছু হচ্ছে এবং ঘটছে সব সেখানেই। ওই একটা জায়গাতেই সমস্ত। আর তো কোনো জায়গাই নেই। কোথায় কি। কোথায় কি।

পরিচ্ছেদ—১৫

আমার সেই কথায় আসি। আমার তখন বয়স অনেক কম। সে কি আজকের কথা। সে কথা ১৯৪৭ সালের জানুয়ারির কথা। গল্পটা এরকম চলছে। মনে কি খেয়াল হয়েছে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। গান্ধীজী তখন নোয়াখালির পথে।

গান্ধীজী যখন এই বয়সে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চ'লে যেতে পারলেন আমিই বা কেন না যাই। বৃদ্ধ একটি মানুষ কর্তব্যের ডাকে এতটা পথ চ'লে গেছেন। আমি কেন যাব না। আমারও তো কিছু করবার আছে।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আমি বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক কবে আমি বেরিয়েছিলাম তা এখন আর আমি বলতে পারছি না। ওই রকম সময়েতেই হবে।

বেরিয়ে আমি চ'লে গেলাম একেবারে সেইখানে—যেখানে আজকাল বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান। গোয়ালন্দ গিয়ে তারপরে মস্ত এক জলযানে আমি চ'লে গেলাম এ দেশ থেকে ও দেশ। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম একটাই দেশ। তারপরে দেখলাম অন্য আর একটা দেশ। এখন বুঝতে পারি—এ সমস্তই বাজে কথা। একটাই মাত্র দেশ। যেখানে যত দেশ একটাই মাত্র দেশ।

আমি এসে পৌঁছলাম পূর্ববঙ্গে। তখন কি নাম ছিল আর এখন কি নাম হয়েছে—সে সব ভাল ক'রে আমার মাথায় আসে না। আমি দেখি এক আকাশের তলায় আমরা সবাই বাস করি। তলায় আর উপরে—এ

সব কথাও বাজে কথা। আমার চোখে এই দুনিয়াতে সকলেই আমরা এক জায়গাকার অধিবাসী।

তাই বলছি, আমি সেই সেখানেই গিয়ে পৌঁছলাম যেখানে এখন অন্য দেশ বলে। অন্য দেশ মনে করে তাই বলে। আমি অন্য দেশ মনে করি না। তাই আমার কাছে অন্য দেশ নেই। আমার কাছে একটাই দেশ, এখনও একটাই দেশ, তখনও একটাই দেশ।

হয়তো কখনো কখনো একটু যেন ভুল হয়ে যায়। তখন হয়তো কত কি মনে করি। কিন্তু সে সব ভুল—একেবারেই ভুল।

সে যা হোক আমি একটি মোটরে উঠে বসলাম। কিন্তু হায় মোটরযান গোলমাল করতে লাগল।

অনেক সাধন-ভজন করার ফলে শেষকালে হঠাৎ মোটর চলতে রাজী হ'ল। রাস্তায় অনেক ঝকমারির ভিতর দিয়ে আমরা অনেক বেলায় রামগঞ্জ এসে পৌঁছুলাম।

দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গ জুটে গেল গান্ধী ক্যাম্পে যাওয়ার। তার মধ্যে একজন ছোকরা। সে আর আমি পিছনে। আমি শুধালাম, 'আপনি ওখানে যাচ্ছেন কেন?' সে বললে, 'আমি আনন্দবাজারের রিপোর্টার।' আমি বললাম, 'ও। রিপোর্টারের পাল্লায় পড়েছি। ওমা! একটু বাদে ভেঙে বললে, 'আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের কথা শুনেছেন? আমি ওদের লোক।' আই. বি.'র সঙ্গে কথায় বুঝতে পারলাম যে-ভদ্রলোকটি এগিয়ে গেছেন তিনিও ওই সম্প্রদায়ের।

খানিক বাদে একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম ওই আই. বি. ভদ্রলোকের খাতিরে—ফাঁকতাল্লায়। চ'ড়ে কেল্লাফতে করলাম—ফতেপুরের নাগাল পেলাম। মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে এই ফতেপুর গ্রামে আছেন। প্রথমে বিষম একলা প'ড়ে গেলাম ফতেপুরে গিয়ে। বাপুজীর সঙ্গে না কি দেখা হবে না, বিশ্রাম কচ্ছেন। দোষ নেই। আমরাও আনন্দময়ীর দরবারে কখনো কখনো অমন ক'রে লোক সরিয়ে থাকি। মহাত্মাজীর কাছে এক-খানা চিঠি পেড়ে দিলাম। একখানা চালাঘরে আশ্রয় নিয়েছি। একটি

বৃদ্ধ (শ্রীসতীশচন্দ্র সেন) স্নেহের সঙ্গে আলাপ করলেন। দেখলাম কয়েকটি ছোকরা বয়সোচিত হল্লা করছেন।

মহাত্মার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই কিছু মহাত্মা নয়। তাঁদের মতও ভিন্ন ধাঁজের। সে রকমও পেলাম না তা নয়। শুনতে পেলাম, মহাত্মা আজই এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এটা মুসলমানদের মাদ্রাসা। এই গ্রামে হিন্দু নাই বললেই চলে। বহু মুসলমান আনাগোনা কচ্ছেন এখানে দেখতে পেলাম। অনেককেই বেশ ভদ্র মনে হোলো।

যেভাবে এখানে এসে মহাত্মাকে পাব মনে করেছিলাম এসে দেখলাম সেভাবে পাবার জো নেই। একটা কথা বলি। সঙ্গে তাঁর এই গ্রামের যাত্রায় লোক নিতান্ত কম নেই কিন্তু। একদল সৈনিক এবং সংবাদজীবি-দিগের কথা ছেড়ে দিলেও কিছু পাঞ্জাবী, একজন বিহারী আর এক আধজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন। আর আছেন মহাত্মার নিজের ব্যক্তিগত সঙ্গীর মধ্যে নির্মলবাবু এবং রামচন্দ্রজী। এক আধটি মহিলাকেও দেখেছি।

বিকেলে স্কুলের পাশে ময়দানে প্রার্থনা সভা হোলো। বহু মুসলমান একত্রিত হয়েছিলেন। প্রার্থনা ইত্যাদি হোলো। সঙ্গীত হোলো। সৌরেনবাবু হাততালি দিয়ে রাম নাম করলেন এবং করালেন। বুড়ো এই দিনে গ্রামের মধ্যে কোথায় ঢুকে হাততালি দিয়ে রাম নাম করাচ্ছেন— বলিহারি যাই বাবা!

মহাত্মার বক্তৃতা সুন্দর। সময়োপযোগী। এখানে কে তাঁকে কি খাওয়াতে এসেছিল। তিনি খাননি। তিনি প্রেমের ভুখা। তিনি এখানে এসেছেন পরীক্ষা দিতে। ইত্যাদি। নির্মলবাবু বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন। তারপরে একজন মুসলমান এক বক্তৃতা দিলেন। ভাল ভাল কথাই বললেন।

রাত্রে যেখানে বাস করলাম সেটা একখানা টিনের ঘর। সারি সারি ব্যবস্থা। আমার ডানদিকে শুয়েছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক সতীশবাবু। ইনি অনেকটা গান্ধীজীর মত দেখতে। ভ্রূণ-হত্যা নিবারণ কল্পে নানা জায়গায় একাধিক অনাথ আশ্রম খুলেছেন ইনি।

মহাত্মার সঙ্গে আমার থাকা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমায় সঙ্গে নিতে আপত্তি। কিন্তু এই বৃদ্ধ আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। দেখি কি হয়।

শেষরাত্রে উঠতে হয়েছে। এখানে সবাই তাই ওঠে। আজ সকাল-বেলা সাড়ে সাতটায় মহাত্মাজী রওনা হবেন। তার আগে তাঁর ঝাঁপ দেওয়া ঘরে কার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। তারপরে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে হবে দাশপাড়া। বোধ হয় মাইল দুয়েক হবে।

এই প্রভাতের ঠাণ্ডায় গেঁয়ো রাস্তার উপর দিয়ে শুধু পায়ে চলেছেন বৃদ্ধ। আশেপাশে পিছনে বহু লোক। সকলে বৃদ্ধের সঙ্গে তাল দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলেছেন। ফোটোগ্রাফাররা হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি কচ্ছেন ফটো তোলার জন্য। একজন সাহেব ফটোগ্রাফারও আছেন।

প্রথমে যখন মহাত্মা চলতে আরম্ভ করলেন আমি কাছাকাছি সঙ্গ ধরলাম। শুনতে পাচ্ছি বুড়ো মুসলমান-হিন্দু সম্পর্কিত একটি গল্প কচ্ছেন। কিন্তু আমায় পেছিয়ে যেতে হোলো। আমার হাতে আমার বোঝা ছিল। কতকটা সে কারণেও বটে আর কতকটা অন্য লোকের মাতব্বরিতে। অনেকেই যদি এগিয়ে যায় অনিবার্য কারণে আমার পেছিয়ে পড়া ঘ'টে যায় যে!

সে যা হোক্। কতকটা পর্যন্ত আমার প্রয়াস আমি ছাড়লাম না।

একে বুড়ো মানুষ, তায় শুধু পা, তায় আবার এক পোল পার হতে হোলো যার তুলনা এরকম নিতান্ত গ্রামে ছাড়া আর কোথাও মেলে না। গান্ধীজী তার আবার এক ইংরেজী নাম বলছিলেন ঠাট্টা ক'রে—হাডিঞ্জ

·

যেখানে এসে মহাত্মা আড্ডা নিলেন সেটা হিন্দুর বাড়ী। আমরা দুজন অর্থাৎ সেই বৃদ্ধ দাদু সতীশ সেন আর আমি আড্ডা নিলাম বৃক্ষতলে গান্ধীজীর নাগালের কাছে। খড়টড় বিছিয়ে তার ওপোর সতরঞ্চি বিছিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসা গেল। সামনেই একটু দূরে একটা ঘেরা জায়গায় মনু গান্ধী আর মহাত্মাজী রয়েছেন। বোধকরি মালিশ করা হচ্ছে মহাত্মাজীকে।

আজ নির্মলবাবু আমার সামনে আমার সেই বৃদ্ধকেও শুনিয়ে দিলেন যে মহাত্মাজীর সঙ্গে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। গান্ধীজী নাকি একমাত্র একজনকে নিয়ে থাকতেই ইচ্ছুক ছিলেন মূলেতে। মূলে যাই থাক বাস্তবেতে বাপুজীর বহু সঙ্গী।

বিকেলে প্রার্থনা সভায় মুসলমান খুব কম এসেছিল। মহাত্মাজী যা বললেন তার সারমর্ম এই তিনি নাকি শুনেছেন যে সঙ্গের মিলিটারি পুলিশের ভয়ে নাকি ওঁরা অনেকে আসেন নি। এটা দুঃখের বিষয়। মহাত্মা গভর্ণমেণ্টকে লিখবেন সরিয়ে নিতে। আর তাঁরা যে রেখেছেন সেটা রাখা কর্তব্য বিবেচনা ক'রেই। কিন্তু কত সুরক্ষিত অবস্থার ভিতরেও খুন হয়ে যায় এরকম ইতিহাসে আছে। আবার অসুখ ক'রেও মানুষ মরে, মিলিটারির সীমার বাইরে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমায় নির্মলবাবু বললেন, "শেষ রাত্তিরে মহাত্মার কাছে গান গাইতে পারবেন? আচ্ছা রাত্তিরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" গাছতলায় থাকাটা ভাবতে ভালো কিন্তু ঘ'টে ওঠাটা দারুণ। আমি আর সতীশবাবু গিয়ে আশ্রয় নিলাম একটা বাড়ীতে মহাত্মার আবাসস্থল থেকে বেশ খানিক দূরে। কি আর করি। কিন্তু রাত্তিরে নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করার পরে তাঁর কথানুসারে আবার বিছানা নিয়ে এলাম। এসে এবার আশ্রয় নিলাম বড় একখানা ঘরে।

শেষরাত্রে মহাত্মাজীকে গান শোনাতে হবে। শুনতে পেলাম আমার চিঠিখানা না কি তাঁকে শোনানো হয়েছে। রাত কেটে গেল কোনোরকমে। ভারী ঠাণ্ডা। ভোরের কিছু পূর্বে মহাত্মার কাছে গেলাম। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটু প্রার্থনা সভা। মহাত্মা মশারীর মধ্যে, কি সব পাঠটাঠ হ'ল। তারপর আমায় গান গাইতে ইঙ্গিত করা হ'ল।

গান গাইলাম। কি আর চাহিব বল। হে মোর প্রিয়, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও—অতুলপ্রসাদের এই গানটা।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব রাম রাঘব এই সবও হোলো। মনু গান্ধী গীতা পাঠও করলেন অনেকখানি।

তখন সকাল হোলো, আমার ধারণা যখন সাড়ে সাতটা বেজে গেল তখন মহাত্মাজী চলতে আরম্ভ করলেন। আমার কথাবার্তা – মহাত্মার সঙ্গে interview আরম্ভ হোলো পথের পরে।

মাহাত্মা প্রথমে আমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন।

মহাত্মাজী—মাতাজীর কাছে কতদিন আছ ?

আমি—আট বছর সমানে ছিলাম। তারপর কখনো থাকি কখনো থাকি না।

মহাত্মাজী—তোমার কত বয়স ?

আমি—২৬ বছর।

মহাত্মাজী—মাতাজী এখন কোথায় ?

আমি—এখন কাশীতে আছেন। পথ চলেছি। মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ি আমি। মহাত্মার সঙ্গে আমি ছাড়াও বহু লোক।

আমি বললাম, "বাপুজী, আমি প্রশ্ন করব কি ?" মহাত্মা যা খানিক বললেন তাতে মনে হোলো তিনি সায় দিলেন।

আমার মনের তখনকার যা অবস্থা তাতে আমি ওঁর সে কথাগুলো ধ'রে রাখতে পারি নি। সব কথাগুলো ভালো ক'রে আমার কানেও ঢোকেনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা এই যে আপনার কাছে রাজারাম কীর্তন হয় সত্যি সত্যিই ভগবান রাজারামের রূপে এসেছিলেন ?"

মহাত্মা—রাম রাজাই তো। রাজাও বটে, ছোটখাট বস্তু তাও রাম।

দশরথের ছেলে রাম। কিন্তু সেই একদিন ঘটেছিল তা নয়। আমি তো মনে করি সব কিছুতে এমন কি দোষের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যেও রাম আছে; তা না হ'লে সে দোষ, অন্যায় কে করায় ? তিনি অফুরন্ত। নেতি নেতি ক'রে তাঁর বিচার আছে। আবার ইতি ক'রেও বলতে পার।

আমি কথা বলছি। এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। একজন শিখ—খুব লম্বা চওড়া চেহারা ভদ্রলোকের—নামেও সর্দার কাজেও সর্দার—তিনি দূরের থেকে বোধ হয় ভেবেছেন যে এ ছোকরা গান্ধীজীর এত কাছে কাছে

যায় কেন—এরকম মোড়োলি তো ভাল নয়। তিনি ঝাঁ ক'রে আমায় ছোঁ মেরে সরিয়ে দিলেন। নির্মলবাবু আমার পক্ষ হয়ে বললেন, এর গান্ধীজীর সঙ্গে interview আছে। তিনি মেনে নিলেন ও বললেন, ও আচ্ছা।

মা'র ইচ্ছেতে আমার মনের মধ্যে সে সময়ে কোনো বিশেষ বিকার উপস্থিত হয়নি। আমি একটু সময়ের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে মহাত্মার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম। গ্রামের রাস্তা।

আমি—আচ্ছা ভগবানকে ভেবে গম্ভীর না হয়ে লোকে কেঁদেকেটে একসা হয়। এ কি রকম?

মহাত্মা—ভালোবাসায়, ভাবেতে এ রকম করে।

আমি—হওয়া উচিত গম্ভীর, আসা উচিত সাম্য। তা না হয়ে কাঁদা-কাটি কেন?

মহাত্মা যা বললেন সে কথাটা আমার মনে যে ছায়া ফেললে তা এই যে, গম্ভীর সকলে কি হয়?

আমি—আচ্ছা, সর্বভূতে ভগবান কি রকম?

মহাত্মা—ভগবান নিরাকার। সর্বভূতকে দেখা যায় যার যার আকারেই।

আমি—আপনার ওই বোধ কি হয়েছে?

মহাত্মা—তোমারও যেমন বোধ আমারও তেমন বোধ হয়েছে। তা না হ'লে অভেদ কি ক'রে মানা হয়?

আমি—আমায় আপনাতে অভেদ কি দৃষ্টিতে?

মহাত্মা—আত্মার দৃষ্টিতে। তা না হ'লে আমার বাইরের চেহারা একরকম, তোমার আর একরকম।

কথা চলছে। গ্রামের রাস্তা। মহাত্মার সাথে সাথে চলেছি।

মহাত্মা বললেন, সর্বভূতে তাঁকে দেখা যাবে কি ক'রে? 'দেখা' শব্দের উপর জোর দিলেন মনে হোলো।

বললাম—বোধরূপে তো হতে পারে।

মহাত্মা সুন্দর একটি কথা বললেন। আমার দুর্ভাগ্য যে স্মৃতির পথ থেকে না জানি কেমনে তাকে হারিয়ে ফেলেছি।

তখন point টুকে রাখলে হয়তো বেঁধে রাখা যেত কিন্তু আমি তখন যাত্রী।

সে যা হোক। আমার ব্যক্তিগত প্রশ্নে মহাত্মা একটু বিব্রত বোধ করলেন মনে হ'ল। বললেন, "এ সব কথা বিতণ্ডার দিকে চ'লে যাচ্ছে।" আমি বললাম, "আপনি যদি বলেন তবে তো আমাদের ভরসা হয়।" মহাত্মা বললেন, "হ্যাঁ সেই জন্যই তো আমিও বললাম।"

আমার কথা হয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়ে—গ্রামের লোকে দেখালে একজায়গায় একজনকে মুসলমানেরা মেরে কবর দিয়েছে। তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

তারপরে এসে আমরা জগৎপুর গ্রামে প্রবেশ করলাম। বাড়ীর বাইরে বসেছিলাম। নির্মলবাবু ভিতরে যেতে বললেন।

সকাল থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত আমি, সতীশবাবু এবং একটি মহিলা গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়ালাম। যে সব অবস্থার কথা শুনলাম, বাড়ী, ঘরদোরের অবস্থা দেখলাম—ভাবা যায় না। দুই একজন এমন মুসলমানের দেখাও পেলাম যারা সত্যিই ভাল। গ্রামের হিন্দু-পরিবারের কাছ থেকেই এ পরিচয় পেলাম।

একটা কথা বলি। নোয়াখালিতে এ অঞ্চলে অন্ততঃ যে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে পেলাম তার তুলনা হয় না। পুকুর, খেত আবার আর এক দিক দিয়ে নারকেল গাছ, সুপুরি গাছের অপরূপ অজস্রতা। উর্বরা রসাল হেথাকার ভূমি। নিবিড় সবুজ শ্যামল শোভায় সুন্দর এ দেশ—হেথায় কেন যে এমন ঘ'টে গেল তা জানি না।

আজ এ গ্রামে মহাত্মার আগমনে বেশ সমারোহ দেখতে পাচ্ছি। লোকজন জমেছেন অনেক। সন্ধ্যার খানিক আগে মাঠের মধ্যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হ'ল। মহাত্মা এলেন, বসলেন। এ সব সভা দিশি

কায়দায়। লোকজন মাটিতে বেশীর ভাগ আর মহাত্মা বসেছেন একটা চৌকির ওপরে।

প্রথমে হোলো প্রার্থনা। মুসলিম ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তিও হোলো।

একটি মেয়ে গাইলেন রবিবাবুর 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' এই গানখানা। নোয়াখালিতে মরণের সত্যটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ভয় এত দুরতিক্রমণীয় হয়ে জেগেছে যে নিজের চোখ বুজে মরণকে এড়াবার চেষ্টা না ক'রে সরল সত্য মরণকে ভালোবেসে মনে মনে বরণ ক'রে নেওয়াটাই বেশী ভাল মনে হয়।

মেয়েরা—আমাদের বাংলার মা বোনেরা উলু দিতে লাগলেন।

মহাত্মা তাঁর বাণী শোনাতে লাগলেন হিন্দীতে।

"একটা কথা আমার কানে এসেছে। তারপরে সে কথাটা আরো স্পষ্ট হয়েছে। আমি আমার ধর্ম মনে করি, যা শুনেছি, গোপন না ক'রে স্পষ্ট ব'লে দেওয়া। কথাটা এই যে. অনেককে জোর ক'রে মুসলমান করা হচ্ছিল। লুট হয়েছে, ঘর দোর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর জোর ক'রে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো তাও হয়েছে। মুসলমানেরা বলেন যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। কিন্তু আমি বলি, এর মধ্যেও জবরদস্তি রয়েছে। খৃষ্টানদের মধ্যে একটা কথা আছে যে দশ বছর বাদে বাদে একটা দুষ্কাল আসে। তখন লোকে কি করে? ছোট শিশুদিগকেও ক্ষুধার জ্বালায় বেচে দেয়। ক্ষুধার্ত লোকেরা যা তা খায় তা দেখেছি। আমার প্রাণ কেঁদেছে তাতে। ক্ষুধা এমন জিনিস, যে কাউকে ছাড়ে না। মায়েরা পর্যন্ত ছেলে বেচে দিয়েছে। দু তিন টাকাতেই সন্তান বেচা সম্ভব হয়ে যায়। তখন কি হয়! সেই অসহায় শিশুদের নিয়ে খৃশ্চান বানায়। এই ভাবে তারা বাপদাদার ধর্ম ফেলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। এটা জবরদস্তি বলতে হবে। এবং এখানে নোয়াখালিতে জবরদস্তি হয়েছে। এরকম জবরদস্তির সমর্থন ইসলামী ধর্মগ্রন্থে নেই। পেগম্বর সাহেব ছিলেন—তিনি কি রকম সত্যভাবের কথা ব'লে গেছেন। চারজন খলিফার যে ইতিহাস তা পড়লে রোমাঞ্চ হয়। মূলে যদি জবরদস্তি থাকত তাহলে ইসলাম

ধর্মের এরকম স্থায়িত্ব সম্ভব হ'ত না। আমি ধর্মের খারাপ জিনিস বর্জন ক'রে ভাল জিনিস গ্রহণ করি, যেটা ভাল লাগে নিজের ক'রে নিতে পারি। আমার কাছে আসে যে হিন্দু হবো। ভাল জিনিস আছে এ তো ঠিক কথা। কিন্তু আমি জানাই খারাপ জিনিসও এতে আছে। যেমন অস্পৃশ্যতা। আমি নম্র হয়ে বলব যে, আমি বেরিয়েছি হিন্দু, মুসলমান একপ্রাণ করবার জন্য। সকলেই সেই আদমের সন্তান, মনুর সন্তান। বস্তু একই। আদমই বল, মনুই বল। তাই বলি ঝগড়া কিসের? কেন একজন আর একজনকে মারে, অন্য ধর্মে নিয়ে আসে? তোতাকে রাজারাম রাজারাম বলালে সেও বলতে থাকে। কিন্তু তাতে ফল কি? আমি স্বীকার করি যে আমি মুসলমান কিন্তু আপনারা যা বলবেন তাই করতে হবে তা পারব না। আমি নিজের রাস্তায় আছি। আমি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসী, শিখ। আমায় আপনারা ভোলাতে পারবেন না। আমি এই জঙ্গলে নিজের কথা ব'লে যাব। আমি হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা এনে দিতে চাই······এনে দিতে চাই সুখ শান্তি।"

রাত্তিরে আমি এসে গ্রামের এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলাম। ভোরে মহাত্মার কাছে গিয়ে বিদায় নিলাম।

বিদায় নিলে কি হবে—আজ যাওয়া লেখা নাই। যখন যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল রাত্রে যাঁর বাড়ীতে ছিলাম তিনি আমায় অনুরোধ করলেন আজ থেকে যাওয়ার জন্য।

আমারও ভেতরে না যাওয়ার জন্য একটা ভাব জেগেছিল। তাই মেনে নিলুম চট্ ক'রে। বিকেলের দিকে ওঁর সঙ্গে লামচর গ্রামে যাব ভাবছি, আজ সকালে মহাত্মা গান্ধী ওখানেই গেছেন।

ত্বপুর বেলা। বাহির বাড়ীতে একখানা চেয়ার খোলা জায়গায় এনে ব'সে ভাবছি তাই তো! কী সুন্দর প্রকৃতি মায়ের কোল এখানে। কী সবুজ বন। সুপুরি গাছগুলো তুলছে। নারকেল গাছের ডগা রোদ্দুরে ঝিলমিল করছে। বাঁশঝাড় ওদিকে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এপারে কলাগাছগুলো একটা ঘনসবুজ রঙের আবহাওয়া তৈরীর চেষ্টা করছে।

সামনের নারকেল গাছটার ওপাশে একটা খড়ের স্তূপ দেখতে পাচ্ছি, শুধু খড় না ওর ভেতরে আর কিছু মাল আছে, জানি না। আর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা সবুজের মধ্যে আত্মহারা হয়েছে। কী পাখী যেন ডাকছে ওদিকে। সবটা মিলে বেশ একটা মনোরম মাধুর্য যেন সহজ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে এখানে বিরাজ কচ্ছে। আমি ভাবছি এমন জায়গায় বিপ্লব বাঁধল কি ক'রে। কোথ্‌থেকে এল এমন রাক্ষুসে হানাহানি যা এখানকার এই নিবিড় স্নিগ্ধ শান্তিকে চিরে ফেড়ে একাকার ক'রে দিলে। সে বেদনা অনুভব হয় এখানকার মানুষের সংস্পর্শে। হয়তো এমনই নিয়ম। বিরোধই হয়তো সহজ। হয়তো স্বভাবের এই নিবিড় কোলের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল হানাহানির বিষ, চাপা ছিল রক্ত-চক্ষু আর ঢাকা ছিল রক্তের দাগ। তাই একদিন দেখা দিতে পারল। নতুন জিনিস কোথায় পাবে! পরতে পরতে যা লুকানো থাকে সে পরতে পরতে ঢাকনা খুলে খুলে তাই প্রকাশ ক'রে দেখায় আমাদেরকে।

বিকালবেলায় আমি, বিশ্বেশ্বরবাবু এবং আর একজন চললাম লামচরের দিকে। রাস্তায় বিশ্বেশ্বরবাবু একখানি বাড়ি দেখালেন যা শুধু ধ্বংসাবশেষ। ইনি সেখানে ঘর তুলতে চেয়েছিলেন। মুসলমানেরা তাও নাকি রাজী হয়নি। অদ্ভুত!

লামচরে গিয়ে দেখি মহাত্মার আগমনে রীতিমত সমারোহ। একটা জায়গায় মৃতদেহ, হাড়গোড় এ সব প'ড়ে রয়েছে, বিদ্বেষে যে আগুন জ্বলে ওঠে তার ভস্ম।

সভা বসল—যেমন বসে। ওমা দেখি একটি মেয়ে টুক্ ক'রে মহাত্মার হাতে একটি মালা দিলেন। বোধহয় জপের মালা হবে। কি যেন পাঠ হোলো। তারপরে মহাত্মাজী বললেন, "দো মিনিট শান্তি"। একটুকাল মৌনী হয়ে গেল সকলে। মহাত্মাজী এর পরে বললেন, "প্রার্থনা"। বাস্ আরম্ভ হয়ে গেল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' ইত্যাদি। তারপরে 'যংব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈর্বেদৈঃ' ইত্যাদি। তারপরে আবৃত্তি হ'তে লাগল গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য

কেশব' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি' পর্যন্ত। আরো কি পাঠের পর মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি হ'ল। অতি চমৎকার।

তারপরে সৌরেনবাবু গাইলেন, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে। চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনাদেনা, বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে। তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে। যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়। কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়।

······তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—আহা, নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে, আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

এবার রাম নাম গাইলেন সকলকে নিয়ে। আমি খোল বাজালাম।

রামনাম হয়ে গেলে মহাত্মাজী বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

"ভাইয়োঁ বহিনোঁ, আজ আমি যে জিনিস দেখেছি, যে বিষয়ে শুনেছি সে কথা আমি বলতে চাই না। প্রশ্ন এই জেগেছে যে যাদের বাড়ী ঘর দোর জ্ব'লে গেছে সেই হৃতসম্পত্তি কারিগরদের কি অবস্থা হবে।"

"আমাদের গাঁয়ে পুরাণ কাব্যে একটা জাতির কারিগরের উল্লেখ আছে। তখনকার সমাজব্যবস্থা এইরকম ছিল যে তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাওয়া কাপড় এ সব নিয়ে তাদেরকে কাজ ক'রে দিত। গম নিত, চাল নিত, দুধ ঘিও নিত তারা। কৃষকদের ধর্ম ছিল দেওয়া আর কারিগরদের ধর্ম ছিল কারিগরি ক'রে দেওয়া, এ ব্যবস্থায় সে সময়ে তারা না খেয়েও মরত না, ন্যাংটাও থাকত না।"

"এখন কি করা দরকার? সরকারের উচিত—সরকারের পরম কর্তব্য হচ্ছে যা দরকার এই কারিগরদের সব দেওয়া। যেমন তাঁতির কাপড় বোনার জন্য সুতো দরকার। তবে মাগনা দেওয়া উচিত নয়। এই রকম রফা হওয়া উচিত যে এর দাম দশ বছরে দিও বিশ বছরে দিও। যদি এর আগে দিতে পার তা দিও। সরকার যদি এ ব্যবস্থা না করে তো যার

কাছে টাকা আছে তার কারিগরদেরকে সাহায্য করার এ ভার নেওয়া উচিত। যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের ভিতরে সংকার, সংযোগ। আমি যে এখানে প'ড়ে আছি তার উদ্দেশ্য এই যে যা আমি জানি লোককে দিই যাতে লোকের মধ্যে প্রাণের জাগরণ হয়। যারা অন্যায় করেছে তাদের স্বীকার করা উচিত যে আমরা করেছি। দোষ চেপে দেওয়ার জন্য উকিল খোঁজা উচিত নয়।"

"তাঁতিদের জন্য বিশেষ ক'রে বলি শ্রীরামপুরে বলেছিল যে কি করা? তাতে আমি বলেছিলাম যে হাতে সুতো দেওয়া হোক্। আপনাদের উচিত তাঁত বোনার সুতো নিজের হাতে কাটা। খেতের কার্পাস তুলো নিয়ে তার থেকে বানানো প্রয়োজন। এতে অনেক সুবিধে। চালানি তুলো চালা থাকে, আবার তাকে পিঁজে নিতে হয়, এতে সে দরকার হবে না। আর তাছাড়া এতে অপরের মুখাপেক্ষা করতে হবে না, এতে আজাদি অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা রয়েছে।"

"দরকার সকলের সংযোগ। সাহুকার যারা পয়সাওয়ালা তাদের উচিত সাহায্য করা। এটা তাদের মেহেরবানি ক'রে করা তা নয়। এই তাদের ধর্ম।"

সভার পরে একটু ঘুরে জগৎপুর গ্রামে গেলাম।

পরের দিন জগৎপুর গ্রাম থেকে বিদায় নিলাম। বিশ্বেশ্বরবাবু যাচ্ছেন চৌমাহানি। তাঁর সঙ্গে রামগঞ্জ পর্যন্ত এসে ট্যাক্সি করা গেল শেয়ারে। ট্যাক্সি আমাদের বয়ে নিয়ে এল সোনাইমুড়ি পর্যন্ত। সোনাইমুড়ি এক চায়ের দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো, তিনি তাঁর মেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন চাঁদপুরে। আমায় চাঁদপুরে রয়ে যেতে বললেন তিনি। তাঁর অনুরোধে আমি চাঁদপুরে থাকতে রাজী হয়ে গেলাম। একটা দিন থেকে গেলে মন্দ কি?

সোনাইমুড়িতে ভগবৎ কথা চলল খানিক। আবার অনেকরকম অত্যাচারের কাহিনী প্রত্যক্ষ ভোগীর কাছ থেকে শোনা গেল। বাস্তবিকই নিদারুণ এবং বীভৎস।

লাক্‌সামে অনেকক্ষণ সময় ছিল। বৃদ্ধকে আনন্দময়ী মায়ের প্রসঙ্গ প'ড়ে প'ড়ে শোনালাম। কি আর করা যায়। রাত্তিরের দিকে চাঁদপুরে নেমে হেঁটে কালীবাড়ী নামক স্থানে বৃদ্ধের বাসাবাড়ীতে এসে উঠলাম। কি ইচ্ছা ঠাকুরের আমি জানি না। কোনো অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আছে তাঁর।

পরিচ্ছেদ—১৬

একটি কথা আমি বলি। চাঁদপুরেও যেন মনে পড়ে দেবীর একটি স্থানে বিশেষ ভাবে বলি হয়। বলি নিয়ে হোলি খেলা কত স্থানেই তো দেখেছি। এমন কি আমাদের বাড়ীতেও সেই শিশুকালে বলি হ'ত। অনন্ত কাকাই বলি দিতেন এরকমটা মনে পড়ে। তারপরে শেষে অবশ্য অনন্ত কাকা বলির পক্ষপাতী ছিলেন না। শেষকালে অর্থাৎ আমার ভাইদের যুগে কই আমাদের বাড়ীতে কোনো বলি ইত্যাদির কাণ্ড আর আমি ঘটতে দেখিনি, আবার অনন্ত কাকার ধাঁচটাই যেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। আমার তো মনে হয় তিনি আর তখন বলি জিনিসটার পক্ষপাতী ছিলেন না।

আমাদের বাড়ীতে মাছ, মাংস খাওয়া যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল এমন নয়। আমি যতদূর জানি, মাছ, মাংস খাওয়া পূর্বের মতই চলত সেখানে। আমি নিজে অবশ্য এই সব খাওয়া পছন্দ করি না। বহুকাল ধ'রেই আমি এই রকম।

এখন এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, আমি তথাকথিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছি। বৈষ্ণব অথবা শাক্ত—ওই রকম ধরনের ভেদ আমার মনের মধ্যে একেবারে নেই। আমার আদর্শটাই বদলে গিয়েছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, আমি simply একটি মানুষ। অপর কিছুই নই, আমি না হিন্দু, না মুসলমান, না বৌদ্ধ, না খ্রীষ্টান। ও রকম ধরনের কোনো বিভাগ আমার মধ্যে আর নেই। শুধু এ কথা নয়, আমি মনে করি এরকম ধরনের বিভাগ কারোর মধ্যেই থাকা উচিত নয়। আমি

যে মাছ, মাংস, ডিম এ সব খাই না এর কারণ এই, আমার মনে হয় মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমার ওইগুলি খাওয়া কিছুতেই ঠিক না। সেই কারণেই আমি খাই না। গত পঞ্চাশ বছরের উপর আমি ওই সকল থেকে দূরেই থাকি।

তবে খাই না তো খাই না। খাই না ব'লে আমি যে না জানি কি হনুরে সে কথা আমার মনে উদয় হয় না। বলা যায়, আমি এখন ও রসে বঞ্চিত নীলমণি। খেতে প্রাণ চায় না, তাই খাই না।

অমুক মহারাজ খেতেন অথবা অমুক সাধুবাবা খেতেন অতএব তুমি খাবে না কেন—এ কথাটা আমার কাছে তুলবেই না। অথবা এ কথাও তুলবে না যে ঘাস, পাতা, গাছ—এ সবের মধ্যেও তো প্রাণ আছে। তবে তুমি খাবে না কেন। আমার উত্তর এই, আমার প্রাণ ও সব কথায় সাড়াই দেয় না। আমার যে ভালই লাগে না। একটি প্রাণীকে হত্যা না করলে চলে না। অতএব অন্য প্রাণীকেও হত্যা করতেই হবে এ একটা যুক্তিই নয়।

শুধু প্রাণের স্পন্দন নয়, আমি যে কি রকম একটা অনুভব করি। গাছপালাতে ঘাসে সর্বত্রই সেই চেতনা। সর্বত্রই একটি বেদনা এবং একটি চেতনা। কাকে আমি হত্যা করি। আমি কী যে করব সেটাই যেন বুঝে উঠতে পারি না। তবে কি আর করা যায়, মোটামুটিভাবে নিতান্ত পক্ষে মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি অনেক কাল।

পরিচ্ছেদ—১৭

এবারে আসি আর এক কথায়। জ্যোতিষশাস্ত্র অথবা ওই বিদ্যাটি আমার প্রিয় বিদ্যা নয়। কে জানে কেন। একটা উপমা দিয়ে বলবার চেষ্টা করব। জ্যোতিষবিদ্যা আমার কাছে কি রকম যেন বেসুর ঠেকে। এই কথাটা আলোচনা করছি এক রকম অন্তরের তাগিদেই। যদিও

আমাদের বাড়ী থেকেই অর্থাৎ আমাদের বংশের সেই যে পুস্তক বিভাগ ছিল সেই দিক থেকে খান কতক বই ছাপা হয়েছিল এই বিভাগটিকে নিয়ে। তথাপি আমাকে বলতেই হয়, আমি এই দিকটাকে খুব একটা সুনজরে দেখি না। এদিকে এদের সব প্রচারে এবং চিৎকারে বাজার সরগরম।

আমার করবার কিছুই নেই। কত লোক কত পন্থাতে টাকা পয়সা উপার্জন ক'রে থাকে। উপার্জন করার উপায় অনেক অনেক আছে। ভাগ্যগণনা অন্যতম একটি উপায়। কিন্তু আমার চোখে তেমন সুষ্ঠু উপায় নয়। যদিও আমাদের বাড়ী থেকে তিন তিনখানি বই ছাপা হয়েছিল এই বিষয়ে।

এখন আমি যা দেখতে পাই তা বলছি। ভাগ্যগণনার বিদ্যা সমাজের কিছু উপকার তো করেই না, সমস্ত খতিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় এই বিদ্যা অনেক ব্যক্তিকে অন্ধকারে এমন কি গভীর থেকে গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে। সেই গহ্বর হয়তো হতাশার গহ্বর।

সকল দিক বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় এই বস্তুটি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্তই করে। মোটের উপর লাভ কিছু হয় না। হয়তো কোনো কোনো স্থলে আপেক্ষিকভাবে কিছু লাভ হয় অথবা কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনাতে বুঝতে পারা যায়—ব্যাপারখানা অন্যরকম। হঠাৎ যে রকম দেখায় সে রকম ব্যাপার নয়।

এখানে ব্যাপারখানা একেবারে মূলকে ধ'রে। শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো উপকার অথবা ফায়দা এ সব স্থলে হয় না অথবা হ'তেই পারে না। এই জিনিস এমন একটি জিনিস, হাজার লোক এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক প্যাঁচে প'ড়ে যায়।

অনেক কথা হয়। অনেক অনেক আলোচনা চলতে থাকে। অনেকের অনেক দোকান অথবা ব্যবসা হয়তো ফেঁপে ওঠে। কিন্তু মনের দিক দিয়ে দেখলে পরে কিছুই না। একেবারে কিছুই না। বরঞ্চ ক্ষতির পরিমাণ অনেক অনেক বেশী হয়ে পড়ে অনেক স্থলেই। যদি বল, past time হিসেবেই ধরি। তাহ'লে বলব, it is not a very good past time.

It is injurious to health—যেমনভাবে সিগারেটের বিজ্ঞাপনে দেওয়া থাকে আজকাল।

বোধহয় উপমাটা খুব বেশী লাগসই হয়েছে। সিগারেট জিনিসটা এই সেদিন পর্যন্ত খুব একটা রম্‌রমা ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। অন্তত হবার দিকে চলছিল। এমন সময় ভগবানের একটি খেলায় সমস্তই উল্টে গেল। উল্টে গেলে কি হবে। মানুষ এমনই হতভাগ্য যে, সে ঘুরতে ঘুরতে সেই অন্ধকারেই গিয়ে পড়ে। সিগারেট ছিল এক সময়ে যেন ভাল, কিন্তু আবার দেখি ক্ষতিকর বলছে লোকে। আজকাল সিগারেটের প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞাপনেই দেখি লেখা থাকে Smoking is injurious to health.

শাসন বিভাগের নিয়মানুসারেই এই ব্যবস্থা। এখন কথা এই, ব্যবস্থা তো অনেক দেওয়া হয় কিন্তু অবস্থা এখনো প্রায় আগের মতই। ব্যবস্থা অনুপাতে অবস্থা দাঁড়ায় না। আমার এইখানেই দুঃখ। মনে আছে—মনে হয়, একবার সেই সিগারেট পান করবার সখ অথবা ইচ্ছা হ'ল। সিগারেট এক প্যাকেট কিনে খুব জুৎ সহকারে খেতে লাগলাম। এক প্যাকেট ধ্বংস হ'ল, সেই তখনকার দিনে কাঁচি সিগারেট। বাস্। আর তো চলে না। আর এগোয় কার সাধ্য। ওইখানেই ইতি। একটি প্যাকেটেই শুরু এবং সারা। আর কখনো সিগারেট ধরবার চেষ্টা করেছি ব'লে মনে হয় না। ধরাও হয়নি, ধরানোও হয়নি। যতদূর মনে হয় সিগারেট পর্বের এইখানেই ইতি।

পরিচ্ছেদ—১৮

এবার রবীন্দ্রনাথের কথায় আসি। সেই একেবারে প্রথম যুগে আমরা বলতাম রবি ঠাকুর। কখনো রবীন্দ্রনাথ বলতাম না। আমার মা ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। এইখানে এই কথাটা প্রকাশ পায়—আমার মা চিরন্তন সত্যের একজন তেমন তেমন পূজারিনী ছিলেন।

আমার মায়ের আমি ঠিকমত মূল্যায়ন করতে পারিনি। সত্যই পারিনি। কি ক'রে করব বল। বাড়ীতে সেই সময়ে আমার মাকে নিয়ে খুবই আলোচনা হ'ত। বড় বউ সারাদিন বই মুখে নিয়ে প'ড়ে থাকে। সংসারের কাজে কর্মে মন দেয় না একেবারে। এ রকম ভাবে সংসার চলে? এই রকম সব সাত এবং পাঁচ।

এক একদিন অবস্থা একেবারে চরমে ওঠে। কথাটা বাবার কানে উঠে যায়। বাবা তো সংসারের ব্যবস্থা নিয়ে তখন একেবারে নাজেহাল। তারপর এইসব কানে আসাতে হয়ে পড়তেন কখনো দারুণ দুঃখে দুঃখী, আবার হয়তো একেবারে অগ্নিশর্মা। তবে অগ্নিশর্মা খুব কমই দেখেছি। ক্বচিৎ কোনোদিন এরকম ঘটনা ঘটত।

বোধহয় কয়েকটা বছর বাবার টাকার টানাটানি চ'লেছিল। অন্য লোক হ'লে আত্মজীবনীতে হয়তো এই সব কথা লিখতো না। আমি কিন্তু না লিখে ছাড়লুম না। সত্যের খাতিরেও বটে, আমাদের চিত্রটি প্রকাশিত করবার জন্যও বটে।

আমার কি রকম একটা ইচ্ছা হয়, সব কথাই সাধ্যমত প্রকাশ ক'রে দি। দুটো চারটে বিষয় এ রকম আছে প্রকাশ ক'রে লেখা বোকামি। সেইগুলো বাদ দিয়ে যথাসাধ্য সমস্তই বাইরে প্রকাশ ক'রে যাওয়ার ইচ্ছে।

বাবার কথা একটু ব'লে নিচ্ছি। এমনিতে বাবা ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশের ছেলে। ঠাকুরদার মধ্যে ওই ভাবখানা আর একটু অধিক পরিমাণে ছিল। ঠাকুরদা ছিলেন যাঁকে বলা হয় পণ্ডিতমশাই। ইংরাজী অতি সামান্যই জানতেন। হয়তো একটু আধটু। বলা যায় যৎকিঞ্চিৎ। তবে অন্যান্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অথবা পাণ্ডিত্য নিতান্ত যে কম ছিল সে রকম মনে হয় না একেবারেই।

একে তো তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের পুত্র। তাঁর পিতা দুর্গাপ্রসাদ তর্কালংকারের কথা তো বলেছি আগেই। দুর্গাপ্রসাদ সেই যুগের একজন নামকরা পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গ হ'তে নবদ্বীপ এসে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি পড়েছিলেন

নব্যন্যায়। তাঁর দাদা হরিদাস কি বিষয়ে উজ্জ্বল ছিলেন এবং পারংগম ছিলেন সে কথা আমি আর এখন বলতে পারি না।

তবে দুর্গাপ্রসাদ এবং হরিদাস এই দুজনেই যে উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। দুজনেই বিক্রমপুরের বাসিন্দা। বিক্রমপুর থেকে কবে—যেন কলকাতায় এসে গিয়েছিলেন। কবে—এ বিষয়টা আমি ঠিকমত জানি না। তাই বলতে পারি না।

হয়তো পূর্ববঙ্গে তাঁরা বাইরের দিকে খুব একটা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন না। পয়সাকড়িতে তেমন হয়তো নয়, কিন্তু মান মর্যাদায় এবং শিক্ষায় তাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য—এ কথা আমরা বুঝতে পারি এবং জানি।

পূর্ববঙ্গে মাদারিপুরে আমাদের কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলেন। মাদারিপুরেই প্রসিদ্ধ প্রণবানন্দজীর লীলাস্থল। আমরা ছেলেবেলায় প্রণবানন্দজীর সম্বন্ধে এবং সম্পর্কে কত রকম শুনতাম কথা এবং কাহিনী। পরবর্তীকালে কোনো সময়ে আমাদের কানে এসেছে তাঁদের সম্পর্কে কত বিচিত্র ইতিহাস অথবা বিচিত্র ঘটনা।

আমি ব'লেই থাকি এবং এখনো বলছি, এ সংসারে যাঁরা মহৎব্যক্তি তাঁদের সকলের কাছেই আমি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছি। এবং করব। শিক্ষালাভ করাই আমার কাজ। লোকের কাছে ঋণী থাকাই আমার অভ্যাস। পারলে আমি শোধ দেবো, না পারলে দেবো না। ব্যাস্। আমার কথা এই। আর পাঁচজনের কথাতে আমার কিছুমাত্র কাজ নেই। এই হ'ল সার কথা।

যা লিখলাম—লিখলাম বটে, তবে সকলকে আমি জানাই যে, ধার জিনিসটা একেবারে আমার পছন্দসই বস্তু নয়। ধারকে আমি অত্যন্ত বেশী রকমের ঘৃণা করি। মোট কথা আমি বলতে চাই, আর যাই করি না কেন, ধারের আমি একেবারেই ধার ধারি না।

তবুও এমনই সংসারের ব্যবস্থাচক্র এবং অবস্থাচক্র যে আমাকে কখনো কখনো ধারের পাল্লায় প'ড়ে যেতেই হয়। কি করব বল। তখন আমি পাশ কাটিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করি।

এমনও অবস্থা আসে যে, পাশ কাটাবার উপায় থাকে না। তখন চুপ ক'রে ব'সে থাকি ভোঁদার মতো। আবার এমনও হয় যখন অনেকে আমার উপর আক্রমণোদ্যত হয়ে ওঠে। তখন কি করি? কিছুই করি না। চুপ ক'রে থাকবার চেষ্টা করি হাঁদার মতো। এইভাবে কখনো ভোঁদার মতো কখনো হাঁদার মতো আমার রকমটা হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় দেখি না। আমি তো গানেই লিখেছি, নিরুপায়ের উপায় তুমি হে মোর ভগবান।

পরিচ্ছেদ—১৯

মাঝে মাঝে কানে আসে এক চীৎকার। আজ গ্রহণ। বেলা তিনটের সময় হয়তো গেরোণ লাগবে। সূর্যগ্রহণ। চারিদিকে সাজ সাজ রব। আজকে আমরা সবাই গ্রহণের চান করতে যাব। এদিকে দিনকাল পাল্‌টে যাচ্ছে এবং আরো যাবে। এখন আর কারোরই সেকেলের সে সব জিনিসে তেমন একটা আস্থা নেই। নাঃ জাতকুল একেবারে কিছুই নেই দেখছি। বলি, হোলো কি।

নিজেই প্রশ্ন করলাম, আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছি। বাস্তবিকই সমস্তই বদ্‌লে গেল। বদ্‌লে গেল, বদ্‌লে যাচ্ছে এবং বদ্‌লে যাবে। এর মধ্যে কি আছে। কিছুই নেই। এ সংসার এই রকমই বদ্‌লে যায়। সত্যি কথা। স'রে স'রে যায় ব'লেই তো সংসার। চ'লে চ'লে যায় ব'লেই তো জগৎ। তাই বলি, এখানকার ধর্ম এখানকার সবাই পালন কচ্ছে।

যার যার মতো সে সে চলুক। আমার মতো আমি চলব। আমি আর অন্যের মতো চলব কি ক'রে। আমার পক্ষে অন্য চলাটি চলবার উপায় কিছু আছে কি?

গেরণ হয়েছে। হবেই তো। না হবার তো রাস্তাই নেই। গেরণের দিনে আগে দেখেছি রাস্তায় ঘাটে কত লোক চলেছে গঙ্গাস্নানে। এখনো

কি যায় না? এখনো যায়। কাশীতে যায়, কলকাতাতেও যায়, আরো কত জায়গায় সারি সারি লোক চলতে থাকে। গেরণের দিনে চানেতে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়ীতে ছেলেবেলাতে দেখতে পেয়েছি—মেয়েরা গঙ্গায় যাচ্ছেন পুণ্য করবার জন্য। আমিও গিয়েছি। সকলের সঙ্গে আমিও গিয়েছি গঙ্গাস্নানে।

কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সত্যকারের ধর্মের জীবন যাপন করতে সত্য এবং ধর্ম এই দুটো জিনিসই বিশেষভাবে দরকারী। আর কিছুর তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মকে পালন করা। এর সঙ্গে কোনো প্রয়োজন নেই ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠানের এবং নিয়মকানুনের। এতদিন যা করেছ—করেছ। এখন থেকে সংকল্প কর, আমি আর অযৌক্তিক জিনিস নিয়ে থাকব না। যে জিনিসের কোনো রকম ফায়দা নেই সেই জিনিস আমি আর কাছে আনবই না—ধারে কাছে একেবারেই না।

আমি এ কথা জানি, কাকে তাড়াব, কোন্‌খানে তাড়াব। তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার তো উপায় কিছুতেই নেই। আছে বিচিত্র সংসার। আর তার একটা ছায়া। ছায়ার মতো অদ্ভুত। আর তো কিছুই নেই। বাস্। এইখানেই পর্যাপ্ত। কাকে সরিয়ে দিয়ে কাকে রাখব। আগে লোকে বলত ভূত, প্রেত, পিশাচ, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসও। এ গুলোর মধ্যে আছে সামান্য কিছু সত্য। আর বাকিগুলো মিথ্যা। ভয় থেকে, সন্দেহ থেকে, মনের ইচ্ছা থেকে এ সবগুলোর জন্ম। গল্প অনেক শুনেছি। শুনতে বোধহয় কিছুই বাকি নেই। শেষ পর্যন্ত আমি এই জেনেছি, যা বললাম।

দেখ, একটা কথা। আমার এই সব লেখার মধ্যে ভজকট কিছু আছে কি? যদি থেকে থাকে আমাকে খবর পাঠিয়ে দিও। আমি বাধিত হবো।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম, গ্রহণের সময় রান্নাকরা জিনিস ফেলে দেওয়া উচিত কি না। আমি তো আমার ভাব অথবা আমার মত ব'লেই দিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্ত—যেটা ভাল বুঝবে এবং ভাল ক'রেই

বুঝবে সেটাকে গভীরভাবে মেনে চলতে কসুর কিছু করবে না। আর ওই কথাটা ভুলবে না—আমি হিন্দুও নই, মুসলমান অথবা খ্রীশ্চানও নই। আমি simply মানুষ একটি। আমার চারদিকে ধুলোবালি ময়লা জমেছে, মাকড়সার জাল হয়েছে। আবার কখনো অন্ধকার দেখা দিয়েছে। কই, আর কিছুই তো হয়নি। মাঝে মাঝে চারদিকে অন্ধকারের মত কি যেন দেখি। ওটা আলোও নয়, অন্ধকারও নয়। ও সব কিছুই নয়। সম্ভবত ওটা চোখের দোষ মাত্র। আর কিছুই না।

এই কথাটা যে বললাম—এই কথাটা শুধু আমার কথা নয়। এই কথাটা তোমাদের সকলেরই কথা। তোমরা জানো আর না জানো। তোমরা না জানলেই কি কথাটা নাকচ হয়ে গেল! না, না, না। নাকচ হবার জো নেই। ইস্। অম্‌নি নাকচ ক'রে দেবে। ক্ষ্যামতা থাকে তো কর দেখি।

গায়ের জোরে কিছুই করতে পারবে না। এটা গায়ের জোরের কথা নয়। এটা মনের জোরের ব্যাপার।

ব্যাপারটা বোধহয় পরিষ্কার করতে পেরেছি। না কি পারিনি। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র অসীম শূন্যে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে। সমস্তই সেখানে শিশুর খেলা। কার খেলা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এখন অবধি। হয়তো পরে বুঝব। ঠিক আছে। পরেই বুঝব। তবে মনে আক্ষেপ আসে। ৭০ বছর বয়সেও বুঝতে পারলাম না। আর কবে বুঝব ছাই।

তবু এখন প্রশ্ন করি, গ্রহণের সময় রান্নাকরা জিনিস কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল শুনি। কোনো পরিষ্কার যুক্তি এর পিছনে আছে কি? মানতে হবে, মানতে হবে। এই কথাটাই আমরা কিছুতেই মেনে উঠতে পারছি না। মানতে হবে কেন বলছ। আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্তই আবছা অথবা অন্ধকার। হয় পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে, না হয় সমস্তই ধোঁ ধোঁ। কিছুই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

যা রান্না হয়েছে সবই ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে চোখ বুজে খেয়ে ফেল দেখি। ওই কথাটার ওইখানেইশেষ। বার বার ফ্যাঁকড়া তুলো

না। গেরো নক্ষত্রের গতির ফলে কি হয়েছে বোঝবার ক্ষমতা কার? সে একটা প্রভাব হয়তো আছে সদা সর্বদা এবং সর্বত্রই। প্রভাব নেই তোমায় কে বলছে।

এখন আমি বলছি, প্রভাব এবং ভাব থাকলে আছে। থাকলে থাকুক। ও সব জিনিস নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবেই না। সূর্য, চন্দ্র এবং অপরাপর গ্রহ নক্ষত্র আকাশের বিরাট শূন্যতার মধ্যে ঘুরছে অথবা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে তো থাক্। তোমার এর মধ্যে নাক গলাবার দরকারটা কি। নাক গলিয়ে কিছু করতে পারবে কি?

শুধু খাওয়ার কথা বলছি না, গেরনের সময় পায়খানা এবং প্রস্রাব আটকে ব'সে থাকো। কি শাস্তি। কি বোকামি এবং ন্যাকামি। এই যুগে ও সব চলে না। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী মানুষের অধীন ছিল তখন ও সব করেছ করেছ। এখন ও সবের দরকার কি। তখন খোকা ছিলে। অনেক উটপটাং নিয়ম পালন করেছ। এখন বড় হয়েছ। এখন কিছুমাত্র কিছু প্রয়োজন নেই।

একটা সময় ছিল তখন অনেক কিছু কানাঘুষো শুনতে পেতাম। কি শুনতাম বলব? ছুটো না কি বিরাট দৈত্য বাস করে। রাহু এবং কেতু। দেবতাদের সঙ্গে হুলুস্থুলু মারপিট। দেবাসুরের যুদ্ধ কে না শুনেছে? কিন্তু ও সমস্তই পৌরাণিক কাহিনী। ও সব legend ছাড়া কিছুই নয়। একেবারে সোজা কথা।

ও সব গল্প গুজব বলবার এবং শোনবার এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, একটু প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশেও কত রকম কাহিনী শোনা যায়। উপনিষদের তত্ত্বকথা—সে একেবারে সত্য কথা। সে সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলছি না। সেখানেও গল্পের আড়ালে নিছক বাস্তব তত্ত্ববস্তু উঁকি মারছে। যে বোঝবার বুঝে নাও।

বলব একটি কথা? সেইখানেতে হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই। খ্রীস্টানও নেই। বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্মও নেই। সেইখানে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল সত্য বস্তুই আপন প্রভায় প্রকাশিত।

সেইখানে মনকে নিয়ে চল। মনের ভিতর থেকে যা কিছু আবোল তাবোল সমস্তই বাদ দিয়ে দাও—একেবারে নাকচ ক'রে দাও দিকি। বলতে হবে—বার বার অনেক অনেক বার বলতে হবে—আমি হিন্দু নই। আমি কোন মানুষের মনগড়া সৃষ্টির মধ্যেই বাঁধা পড়তে রাজী নই। আকাশের বিশাল সূর্যের মতো আমি যুগ থেকে যুগান্তরে জ্বলতে থাকব এবং জ্বলন্ত বাণী বলতে থাকব, যে ভুল অনেকে করেছে আমি সে ভুল কেন করব। আমি যে সরল সত্যকে বলতে এসেছি। শুধু বলতে নয়, সম্ভব হ'লে মানুষকে দিয়ে যাব এই কথা। শুধু আমার কথা বলছি না। তোমাদের সকলকার কথাই বলছি। কারোর কথাই বলছি না, আমাদের সকলকার কথাই বলছি।

এই যে আমি কথা বলছি, এই আমি তো একজন মানুষ মাত্র নই। আমি তো স্পষ্টই অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। আমি সকলের হয়েই আপন বার্তা জানিয়ে যাই। জানিয়ে যাবার জন্যেই জীবন যাপন করি।

মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বলি—আলতু ফালতু কথা। ওগুলো ঠিক আলতু ফালতু নয় কিন্তু। ওর মধ্যেও গম্ভীর পদার্থ রয়েছে। মনে হচ্ছে বটে—কী বকছে যা তা। কিন্তু আমি কি যা তা বকবার ছেলে? আমি তেমন ছেলেই নই। আমি যা তা বকা অনেকদিন হ'ল ছেড়ে দিয়েছি। এখন হয়তো কোনো এক সময়ে আপন মনে বলতে পারি, যা তা বকাটা আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

যে কথা হচ্ছিল। আমি যেমন খুশি তেমন পড়ি, শুনি আবার বলি, আবার ইচ্ছে হ'লে চুপ ক'রে থাকি। একেবারে সুকুমার রায়ের speak টি not. কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, ওরকমভাবে চুপ ক'রে থাকলে তো কাজ এগোবে না। যে কোনো প্রকারে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে। এইটে হ'ল মোদ্দা কথা।

সুকুমার রায়ের একটি বই পড়েছি হ য ব র ল। বই প'ড়ে দেখতে পাচ্ছি, এই বইয়ের কতগুলো কথা আমার সঙ্গে পরিষ্কার মিল খেয়ে যাচ্ছে। একেবারে হুবহু। দেখে আহ্লাদে আর বাঁচিনে। তবে তো

মিলে যাচ্ছে। বাস্ আর কথা নেই। অতএব আমি আর তোমাদের মতো হেঁজী পেঁজী কেউ নই এটুকু বুঝতে পাচ্ছি।

পরিচ্ছেদ—২০

একটা কথা এবারে বলব, সেই আমাদের অসীমানন্দের কথা। এখন থেকে বহু বহু পূর্বে আনন্দময়ী মায়ের কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম, অসীমানন্দ ব'লে একজন সাধু আছেন। বাঃ, নামটি তো বড় সুন্দর দেখছি।

সেই অসীমানন্দ তখন না কি গুজরাতে গিয়ে বেশ আসর জমিয়ে এসেছে। আমি কিন্তু কথা বলছি হরিদ্বারের কথা। হরিদ্বারে ছাদের ওপোর দাঁড়িয়ে দেখতাম অগণিত সাধু চ'লে যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু সাধু আর সাধু। তারমধ্যে শুনলাম রয়েছেন সেই আমাদের অসীমানন্দ।

অসীমানন্দ যদি যে-কেউ একজন হ'তেন তাহ'লে আর কথা ছিল না। কত সাধুর কথা শুনেছি এবং ভুলে গিয়েছি। আর একজন অসীমানন্দের কথাও জানি। তিনি অতিশয় উচ্চ দরের মহাত্মা। তিনি আমাদের দরবেশজীর শিষ্য। দরবেশজীও যেমন, আমাদের সেই অসীমানন্দজীও তেমন। বলতে গেলে বলতে হয়, এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্।

দরবেশজী বিশ্রুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য। একদিন তিনি অনেকগুলো অনেক রকমের কাপড় মিশিয়ে একটি চাদর তৈরী করেছিলেন। গোস্বামীজী তাঁর ওই চেহারা দেখে ব'লে উঠলেন, বাঃ বেশ। তুমি তো দেখছি দরবেশ সেজেছ। বাস্! সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন দরবেশ। অর্থাৎ আমাদের সকলের পরিচিত কিরণচাঁদ দরবেশ। তাঁরই একজন চিহ্নিত শিষ্য অসীমানন্দজী। তিনি না কি সংকীর্তন করতে করতে পদব্রজে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করেছিলেন। এক তীর্থ থেকে অন্য এক তীর্থে।

সেই এক অসীমানন্দ। যাঁর কথা বলছিলাম তিনি অন্য এক অসীমানন্দ।

এই দ্বিতীয় অসীমানন্দের কথা আমি এখন বলছি। ইনি গুজরাত গিয়ে ঘুরে এসেছেন। আমাদের বিশুদা—অর্থাৎ দেরাদুন রায়পুরের বিখ্যাত বিশুদা এই অসীমানন্দের কাছে না কি দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

আমরা তখন রায়পুর নিবাসী অথবা কিষণপুর থেকে রায়পুর হামেশা যাতায়াত করি। অনেকের মুখে বিশেষ ক'রে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখে অসীমানন্দের কথা আমরা অনেক শুনেছি। এখন অতি সংক্ষেপে অসীমা-নন্দজীর গল্প অথবা কাহিনী ব'লেই ফেলি। আমি যে সেই যুগে আনন্দ-ময়ী মায়ের একজন সঙ্গী ছিলাম এ কথা তো সর্বজনবিদিত। স্বীকার অথবা অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।

ছাদে উঠে দেখতে পাচ্ছি, অসীমানন্দ জনা কয়েক মহিলা শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারের গঙ্গার সমীপবর্তী স্থানে ইতস্তত ভ্রমণ করছেন। আমরা অনেক সময় ছাদে গিয়ে এ সব পর্যবেক্ষণ করতাম। ভিড়ের স্রোতে অথবা ভিড়ের টানে ভেসে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না, সাহসও পেতাম না।

আর সে কি একটা আধটা লোক। পূর্ণকুম্ভ স্নান। সারা ভারত থেকে এসেছে অগণিত পুণ্যার্থী মানুষ। আমরা ছাদের উপর থেকে এ সব দেখছি। পূর্বেই বলেছি আমাদের পীতকুঠীর ভিতর দিয়েই গঙ্গার ধারা চ'লে গিয়েছে। তবে এমন সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে ছাঁদিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে সমস্তটাই একটি অপরূপ রূপ নিয়েছে। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালের কথা বর্ণনা করছি—একথা মনে রাখতে হবে।

পূর্ণকুম্ভ স্নান ঘুরে ঘুরে বারো বছর অন্তর এক একটা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। আবার অর্ধকুম্ভ স্নানও আছে। সেও নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। আবার রয়েছে তারও অর্ধেক। এই রকমভাবে দ্বাদশ বৎসর ধ'রে এই স্নানের সংবাদ। এটি গৃহস্থদেরও পুণ্যস্নান আবার সাধুদেরও বিশেষ একটি মিলন ক্ষেত্র।

আমার নিজের কথা আবার কিছু বলি। এসব ধর্মীয় ব্যাপারে আমার অন্তর থেকে কিছুমাত্র উৎসাহের যোগান পাইনা। কেন? তা আমি

বলতে পারি না। আমার উৎসাহ কি নিভে যাওয়ার দাখিল? না তো! যতদিন আমার কাজ বাকি আছে ততদিন এই রকমই চলবে।

আসল কথা, এসব ধর্মীয় ব্যাপার ঠিক আমার মনের মত বস্তু নয়। আর একটু খুলে বললে বলতে হয়, এগুলো যথার্থরূপে ধর্মীয় কি না এই বিষয়েই রয়েছে আমার গভীর সংশয়। আবার তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই, এসব ব্যাপারের সঙ্গে যথার্থ ধর্ম বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্কই নেই। হয়তো যখন নিতান্ত নীচেকার ভূমিতে বিচরণ করি তখন এসব কথা অথবা এই ধরনের কথা কিছুটা ভাবি অথবা বুঝি।

কিন্তু কিছু পরেই আবার যেই কে সেই। দুটি অবস্থাই আমার থাকে। কখনো এটা, কখনো ওটা।

এর থেকে মনে হয়, কেউ বলতে পারে তুমি এক রকম কথা তো বল না। এই এক রকম বললে, আবার এই আর এক রকম বলছ। এখন আমি কোন্‌টা ধরব। তোমার মুখে তো ঠিক একটি রকম বাঁধিগৎ দেখছি না।

তার উত্তরে আমি বলছি, আমি নিজেই আমার কোনোরকম হদিস আজ পর্যন্ত পেলাম না। আমি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠিনি। এইখানেই তো আমার মুশকিল। এই মুশকিলের আসান কে করবে আর কি রকম ভাবে করবে সেইটে নিয়ে পড়েছি আমি গভীর চিন্তায়। এ ক্ষেত্রে আমার কথা সেই কথা—দেখি কোথায় গিয়ে ঠেকি।

পরিচ্ছেদ—২৯

এবারে আমি বলব আমার একটি চরিত্রগত অথবা ভাবগত নিজস্ব ধারার কথা। গোড়া থেকেই বলি। অতি শিশুকালে দেখতাম বাড়ীতে আমার মায়ের একটা বিশেষ রকমের অভ্যাস ছিল। ঠাকুমা প্রভৃতির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও মা বইয়ের পর বই সাজিয়ে রেখে দিতেন। আমরা

কখনো কখনো সেইসব পুস্তকরাশি থেকে দুই একটা সংগ্রহ ক'রে আপন মনে পড়তাম।

আশ্চর্য দেখতে পেতাম, সেই সব পুস্তকের মধ্যে বাজে নভেল নাটক একটিও নেই। র‍্যাকে সব বই সাজানো থাকত। মায়ের তো আমাদের বাড়ীতে একটা বদনামই হয়ে গিয়েছিল, বউ দিনরাত বই মুখে দিয়ে ব'সে থাকে। একথা আমরা বারংবার শুনেছি এবং বহুবার শুনেছি। তখন সংসারের কর্ত্রী ঠাকুমা। বাবার মা। তিনি তো অবশ্যই কর্ত্রী হবেনই। বাড়ীর মধ্যে তাঁর কথাই সর্বথা সর্বপ্রধান। মা শুধু এক কোণে ব'সে বই পড়তেন। কখনো কখনো দুঃখ পেলে বলতেন এবার আমি কুমোরটুলি চ'লে যাব। কিন্তু কুমোরটুলি কখনোই যাওয়া আর ঘটত না।

আমার কথা বলি। আমি কখনো ঠাকুমার কাছে আশ্রয় নিতাম, কখনো বা মায়ের কাছে। অতি শিশুকালে ঠাকুমার কাছেই আমার ছিল প্রধান আশ্রয়। এমন কি যখন আমি বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করলাম তখনো আমি প্রধানভাবে রয়েছি ঠাকুরমারই হেফাজতে। আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে ছিল দুটি মহল। একটা মহলে মা বিরাজ করতেন তাঁর বই পুস্তক ইত্যাদি সরঞ্জাম সমেত। আর একটা মহলে ঠাকুমা, পিসিমা, কাকিমা এবং অনন্তকাকা, বামা কাকা, বাড়ীর পরিচারিকা খুদু ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যাদি, ইত্যাদি কেন বললাম? তার কারণ এই, অনেক আত্মীয়-স্বজন—অমুকের অমুক, তমুকের তমুক এইসব নানান ব্যক্তি সহজে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন। যেন কোনো কথাই নেই। যেন সবাইকারই সহজে স্বচ্ছন্দে থাকবার কথা। তারপরে শেষে—শেষের দিকে এইসব ঘটনার স্রোতের উপরে একটি যবনিকা পাত হয়ে গেল। এই ঘটনার সূত্রটিও আমি বলি।

একদিন দেখতে পেলাম বাবার মামা সেই দেবেন ঠাকুর বাবার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তায় রত। আমি থাকতাম আমার তালে, আমার ভাবে, আমার ছাঁদে, আমার ভঙ্গীতে। বরাবরই এইটি ছিল আমার স্বভাব।

সবাই সব কিছুতে যোগ দিত, সবাই যার যার ভাবে বিচরণশীল, সকলের জন্যই সেই প্রচলিত পথ।

কিন্তু আমার জন্য? আমি তো কোনো দলেই নেই। পরে দেখি, সব দলেতেই আছি আমি কোনো দলেই নাই। আবার অনেক পরে আমি দেখতে পেয়েছি, আমি এক হতচ্ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া মানুষ। তাই তো আমার সঙ্গে কারোর সঙ্গেই সে রকম একটা মিল হয় না। এবং এও বলি, মিল হয় না ব'লেই তো সকলের সঙ্গে আমার এত মিল। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু—প্রত্যেকটি মানুষ আমার থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। এই একটা গোপন কথা আজকের জনগণের সামনে ফাঁস ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। যা বললাম তাই। যেমনটি বুঝেছি তেমন। আমি এর থেকে কম কিছু নই, আবার বেশী কিছুও নই। বিলকুল নই। হ'তেই পারে না।

তাই বেশী দূর এগোবার সাধ্যই নেই। আমি আর এগোতেও পারি না, পেছতেও পারি না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। বাস্। আমার কথা আমি নিজেই ফাঁস ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। আমি আগে যা কিছু বলেছি সে তো বলেইছি। আবার আমি এই কথাটি এখানে রেখে দি।

যে কথা বলছিলাম সেই কথারই ল্যাজ ধ'রে এখন চলব। মামা এবং ভাগ্নেতে ব'সে ব'সে অনেক কথা হোলো। এমন কি দেখতে পেলাম, দাদাবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে ব'সে একটা নতুন ধরনের plan কষছেন। দাদাবাবু বহু বহুবার ভাগ্যকুল অঞ্চল থেকে অর্থাৎ কি না নিজেদের গ্রাম নাগরনন্দী থেকে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন। তাঁদের গ্রাম ছিল নাগরনন্দী আর আমাদের গ্রাম ছিল তারই অল্প দূরে কাইঠাপাড়া অর্থাৎ যার নাম কাঠিয়াপাড়া। ওই গ্রামে আমি নিজে বার কতক গিয়েছি। জায়গাটি ভাগ্যকুলের একেবারে নিকটবর্তী। এই হিসাবেই কাঠিয়াপাড়া গ্রামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তা না হ'লে কাঠিয়াপাড়া গ্রামকে চেনে কে। ভাগ্যকুলের একেবারে কাছাকাছি—এটাই কাঠিয়াপাড়ার ভাগ্য।

আমার শোনা একটি ছোটো গল্প অথবা কাহিনী আছে। সেটি এখানে না ব'লে পারছি না। পদ্মার তীর। হু হু ক'রে বিরাট পদ্মানদীর স্রোত ব'য়ে চলেছে। পাশেই গ্রাম ভাগ্যকুল। তখনো হয়তো ভাগ্যকুল নামটি হয়নি।

একজন ভদ্রলোক ওই তীরে পায়খানাতে গেছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, তীরের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে টাকা পড়ছে। রূপোর চাকতি সব। তীরও ভাঙছে, অজস্র টাকাও পড়ছে।

ফলে যা হবার তাই হ'ল। সেই লোকটি তো আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেয়েছে। হয়তো প্রাচীনকালে কেউ পুঁতে রেখেছিল সেই টাকা। সেই যুগে অর্থাৎ তখনকার দিনে কাগজের টাকার ব্যবহার ছিল না। হয়তো বা বেশী-টাকার নোট চলত। কিন্তু খুচরো টাকার দর্শন পাওয়া যেত ধাতু-নির্মিত মুদ্রাতেই।

এখন কে বা কারা যেন কলসীতে ক'রে টাকা জমিয়ে ওইখানেতেই রেখে দিয়েছিল গোপনে—সঙ্গোপনে। তারপরে যেই একজনের হাতে সন্ধানটা এসে পড়েছে অমনি সেই ব্যক্তির কপালটা খুলে গেল। মনে হয় সেই থেকে ওই স্থানের নাম হ'লো ভাগ্যকুল। এই ভাগ্যকুলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন রাজা শ্রীনাথ রায়। অন্য এক দিক থেকে তাঁরা ছিলেন কুণ্ডু।

এসব কথা লিখতেও আমার কেমন এক রকম কষ্ট হয় মনে মনে। কে বলে তাঁরা অন্য জাতি, ভিন্ন জাতি অথবা নিম্ন জাতি। কোনো রকমে অথবা কোনো ভাবেই তাঁদের আমরা নিম্নতর আসনে বসাতে পারি না। ও সব দিন অনেক পেছনে প'ড়ে গেছে। আমার মনে হয় যেন অতীত-কালের সেই সব কলঙ্কিত কাহিনী উদ্ধার ক'রে তুলে আনবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, প্রয়োজন একটু আধটু আছে হয়তো। ইতিহাসটাকে খোঁজ করবার মতো কিছু প্রয়োজন পড়ে বৈ কি। বেশ ওইটুকু কথা ওইখানেই

রেখে দাও। একথা বড় কথাই নয়, ছোটো কথাকে ছোটো ক'রে রাখলেই তার সত্যকারের মর্যাদা দেওয়া হবে।

মানুষ যে মানুষ—কেবলমাত্র মানুষ সেই কথাটাই জাগ্রত এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। অন্য সব কথা নিভে যাক্। ভুল দিয়ে তৈরী যে সব কথা সে সব কথা মাথা তুলে ভুলের আসর আর যেন না জমায়।

কেউ হয়তো বলবেন, জাতিভেদ নিয়ে এত কথার দরকার কি। জাতিভেদ কি আর আছে? জাতিভেদ তো একেবারে শেষ হয়েই গেছে। না, একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। নানা আকারে এবং নানা প্রকারে সেই বিকট জাতিভেদ এখনও মাথা তুলছে।

আমি বলি, সত্যিকারের জাতিভেদ থাকুক। যেটা মোটেই বংশগত নয়। যেটা মাত্র গুণগত এবং ভাবগত। সত্যকারের জাতিভেদ তুলে দেয় কার সাধ্য। সে তো অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। সেটি সমাজে অবস্থান করবে—সেই তো ভাল। সেটি মুছে গেলে সমাজের প্রকৃত আলোই যে নিভে যাবে।

পরিচ্ছেদ—২২

এবারে আমার সেই পূর্ব কথায় আসি—যে-কথা আমার জীবন-নদীর ধারা বেয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলছিল। এ যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা আমিও জানি না, আর অন্য কেউও জানে না।

আলোকিতা

প্রথমে বলছি আমার মা আলোকিতার কথা। এই বইখানি প্রস্তুত হয়েছে এবং যতটুকু এগিয়েছে অনেকটাই আমার এই মায়ের জন্যে। ব্যবহারিক ভাষায় যদি বলি, বলতেই হবে, সমস্তটাই ঘটতে পেরেছে আমার মা এই আলোকিতার সৌজন্যে।

আমার এই মা, আমি আশা করি এবং আশীর্বাদ করি সর্বদা থাকুক তার আপন আনন্দে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে।

আমি লক্ষ্য করেছি, এই মায়ের ভিতরে অনায়াসলব্ধ একটি ভাব রয়েছে—যা অত্যন্ত উদার ভাব। শুধু উদার নয়, সেই ভাব যেন আনন্দের আলোয় আলোয় আলোকিত।

আলোকিতা মা আমার, কথা কম বলে। কিন্তু তার গুণ এবং ভাব কম নয়। তা যেমন গভীর তেমন গম্ভীর। তার পূর্বের নাম ছিল কল্পনা পাল চৌধুরী। বাস্তবিকই অন্তরে অন্তরে তার যে-রকম ভাব এবং বস্তুর সম্ভার তাতে বোঝা যায় সাধারণ সকল কল্পনাকে ছাড়িয়ে তার অবস্থিতি। এই পুস্তকের তিনটি খণ্ড প্রকাশ উপলক্ষ্যে সে যা করেছে তার জন্য আমার অন্তরের আশীর্বাদ রইল তার মাথার উপরে।

অনন্তা দেবী

এবার আসছে আমার মাতা শ্রীঅনন্তা দেবীর কথা। প্রথমেই মনে পড়ে, এই পুস্তকখানির প্রকাশের ব্যাপারে অনন্তা মায়ের যে-রকম উৎসাহ এবং আন্তরিক ইচ্ছা দেখতে পেয়েছি তার আর তুলনা হয় না।

প্রথমেই ভাবছি অনন্তার বাল্যকালের কথা। সেই নব রায় লেন। সেই সে-যুগে সেই দাদা বৌদি এবং ভাইবোনদের সাহচর্য, তার আগে পিতা এবং মাতার আশ্চর্য স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে জীবন কাটানো, তারপরে অন্তরের অভ্যন্তরে জীবননাথের গভীর অথচ অস্ফুট এক আকর্ষণ অনুভব করতে থাকা—এইভাবে ক্রমে ক্রমে জীবনখানির উন্মেষ এবং বিকাশ। এইভাবে জীবন ভ'রে জীবনের ডাক শুনে শুনে পরম জাগরণের পথে এগিয়ে চলতে থাকা—এ সমস্তই অনন্তার জীবনে আস্তে আস্তে দল

মেলেছে। তাই বলি, এই জীবন আশ্চর্য জীবন, বহু বহু জীবনের মধ্যে একটি উজ্জ্বল জীবন।

সহজেই, স্বভাবতই মনে এসে যায় আমার মা অনন্তা দেবীর গানের কথা। সে তো গান নয়, সে যেন প্রাণের টুকরো। সে তো গানের দোলা নয়, সে যেন প্রাণের ছন্দ। আশ্চর্য দেখতে পাই, অনন্তা মা তার সমস্ত জীবনখানাই কাটিয়ে দিয়েছে সেই একজনের পূজাতে। এ পূজা কোনো একটি উপবীতধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পূজার থেকে কোন ক্রমেই কম পূজা নয় তো। বরং বেশী পূজা। তার কারণ, এই পূজায় প্রাণ জেগে ওঠে। মন কেঁদে ওঠে। জীবন ভেসে যায় অকূলের কূলে কূলে, জীবন সেখানে ভাসে দুলে দুলে।

প্রজ্ঞা-পারমিতা দেবী অর্থাৎ পুষ্প দে

আমার কোনো সন্তানই যেমন তেমন নয়। যেমন তেমন হওয়ার কোনো রাস্তাই যে খোলা নেই। এক সময়ে দু খেপে যাঁর বাড়ীতে আমি কাটিয়েছিলাম অনেকগুলো বৎসর তিনি অর্থাৎ মহেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয় থাকতেন ১৪/১, সেণ্ট্রাল পার্ক নামক বাড়ীতে। সেই বাড়ীটি উপস্থিত যাদবপুর অঞ্চলেই—কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরীর কাছাকাছি। স্থানটি একটি মনোরম স্থান। এককালে এই রকমই ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য একটু অন্য প্রকারের রূপ নিয়েছে। কলিকাতায় এই রকম ঘটেছে অনেক স্থলেই।

প্রজ্ঞা-পারমিতার বংশধারাতে একটা কিছু অবশ্যই আছে। আমি মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিশে এই কথাটা বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছি।

আমার একটি ছবি মনে পড়ে। এক সময়ে আমি কোনো একটা গ্রামে গিয়ে কিছুদিন আপন মনে ছিলাম। সেই গ্রামে মাঠঘাট সমস্ত দারুণ গরমে ফেটে একেবারে চৌচির শুধু নয় অনেক ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অনেক চিড় খেয়েছে।

আমি সকাল বেলায় মাঠে বেড়াতে বেরিয়ে একেবারে আপনার ভাব-জগতে কেমন যেন ডুবে গেলুম। হঠাৎ এখন মনে পড়ছে গ্রামের নাম ছিল মথুরাপুর। সেই মথুরাপুরে একলা বেরিয়েছি এবং মাঠের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একেবারে একলা ঠিক নয়, আমাদের মহেন্দ্রবাবুও তখন আছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

মাঠের মধ্যে দেখলাম, মাঠের মাটি ফেটে বহুভাগে বিভক্ত। মনে হচ্ছে বিরাট মাঠে কে একজন সুন্দর একখানি map এঁকে রেখেছে। এই রকম সেই ফাটলের নমুনা।

আমি আর মহেন্দ্রবাবু ব'সে আছি একটা পাশে। আমি কি রকম একটা ভাব অনুভব ক'রে মহেন্দ্রবাবুকে দেখাচ্ছি। আঙুল দিয়ে বড় বড় ফাটলগুলো দেখাচ্ছি। আর মনের আবেগে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছি। মনে উঠছিল দুটি লাইন। কোনো একজন বাঙালী কবির লেখা।

পত্রে পুষ্পে দেখি যে সব রেখা—
রেখা নয়, তোমার নামটি তাতে লেখা।।

এই লাইন দুটি মুখে বলছি—আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছি। মনের আবেগ চোখে এসে চোখ ছাপিয়ে বাইরে পড়ছে। এইভাবে আমি তখন আঙুল দিয়ে মাঠের ছবিটি মহেন্দ্রবাবুকে দেখাচ্ছি আর চোখের জলে আমার আপন পূজা সম্পাদিত হচ্ছে।

এই মহেন্দ্র চন্দ্র দে-র কন্যা আমাদের প্রজ্ঞা-পারমিতা। প্রজ্ঞা-পারমিতার আর একটা ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে। চোখে মানে মানস চোখে। একদিন আনন্দময়ী আশ্রমে গীতার ব্যাখ্যা করবার জন্য বসেছি। চলছে তখন কথার পরে কথা। সমস্তই হরিকথা। হরিকে নিয়ে কথা তাই হরিকথা। আসর তখন জমজমাট। সহসা আমার চোখে পড়ল এক পাশে একটু দূরে প্রজ্ঞা-পারমিতা ব'সে শুনছে আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

এ সব ছবি আমার মনের জগতে অঙ্কিত হয়ে আছে। আমি যে

জগতের কিছু একটা কাজ করবার জন্য এসেছি। সেই কিছু কাজ আমার অন্তরের জগতে কতবার ছাপ ফেলেছে। তার কি হিসাব কিছু আছে। কিছুই নেই। শুধু আমি কতগুলো ছবির রেখা এঁকে যাচ্ছি এলোপাথাড়ি।

তারপরে মনে পড়ে প্রজ্ঞা-পারমিতার জীবন-চর্যা। সে তার জীবনের প্রায় সমস্তটাই বিলিয়ে দিয়েছে বা দিচ্ছে আমাদের কাজের উপলক্ষ্যে। আমাদের কাজ মানে সকলকারই কাজ। এই যে সকলের সেবার জন্য জীবন দান করা—এ কি সহজ ভাগ্যে ঘটে। এ জিনিস সকলের ঘটে না এবং সহজ ভাগ্যে ঘটে না। আমি যতদূর দেখতে পাই, দেখি এই সকল মানুষের জীবনে ভগবান যেন এক অঘটন ঘটিয়েছেন।

প্রজ্ঞা-পারমিতা সম্বন্ধে বলতে গেলেই আসে ওরই কাকা ব্রজেন্দ্রনাথ দে সম্পর্কীয় কথা। ব্রজেন দের সম্পর্কে আমার বলবার বেশী কিছু নেই। গ্রাম বাংলার আপামর জনসাধারণ ব্রজেনবাবুর গুণ গাইছেন। আমি এমন এক মানুষ যার গতিবিধি আছে সাহিত্যের জগতে।

সাহিত্যের সংবাদ প্রথম আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছে। তারপরে আমার মায়ের কাছেও। বাবা মা দু'জনই কম বেশী সাহিত্যচর্চা করতেন। মা তো সাহিত্যের মধ্যে অনেকটা সময় ডুবেই থাকতেন একেবারে। মা পেয়েছিলেন আমার মামার বাড়ীর দিক থেকে।

বড় মামা গল্প লিখতেন, আরও কি কি লিখতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় মামা তো একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। একটি দৈনিক পত্রিকাও তাঁর হাতেই চলতো। পত্রিকাটির নাম 'লোকসেবক।' এখন জানি না লোকসেবক পত্রিকাটি টিকে আছে কি না। সে যাই হোক, একটা সময় মামারা দুই ভাই—বড় মামা এবং ছোটো মামা—এই দুই জন বিশেষ বিক্রমের সঙ্গে তাঁদের দিকটা পরিচালনা করতেন। বড় মামা তো এখনো রয়েছেন। আজ ১৯৯০ সালের ৩০শে আগস্ট লিখছি। আমাদের বড় মামা হয়তো তাঁর ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে ব'সে আছেন। ছোট মামা তো অনেক-দিনই হ'ল গত হয়েছেন।

এবার আসছে এই বই সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা। আমাদের বই-এর

দিক এবং আমাদের কাজের দিক সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এসে পড়ে কয়েকজনের প্রসঙ্গ। তার মধ্যে অন্যতম আমাদের প্রজ্ঞা-পারমিতা। প্রজ্ঞা তার নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলেছে আমার আদর্শের জন্য অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার। আমার আদর্শকে ও অর্থাৎ প্রজ্ঞা নিশ্চয়ই তার নিজের আদর্শ ব'লে মনে করে। তাই তো তার এমন ভাবে এগিয়ে চলা। এমন ভাব, এমন গতি, এমন ভঙ্গী—এ সব প্রজ্ঞা-পারমিতারই নিজস্ব ভঙ্গী অথবা নিজস্ব ধারা। এমন চলা চলতে আর কে পারবে। উপমার কথা ওঠে না। দরকারও নেই। তবু মনে হয় আশ্চর্য এই প্রজ্ঞা-পারমিতার জীবন-গতি।

আমাদের এই কাজের দিক দিয়ে প্রজ্ঞা-পারমিতা করেছে অনেক কাজ এবং অনেক বিস্তার। কত ভাবে কত কি। এবার ওর জীবনের সেই দিকটার কথা বলি—যে দিকটাতে ও চলেছিল অন্য এক পথে।

ও অন্য এক সাধুর কাছে পূর্বে একবার দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। ওরও কোনো দোষ দিতে পারি না, সেই সাধুবাবার কোনো রকম ভুলের বা দোষের প্রশ্ন ওঠেই না। যে সাধুর কথা বলছি তিনি একজন নামকরা সাধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই রকমটাই হয়েছিল।

কেন এরকম ঘটেছিল। কেন কে জানে। এর পিছনে আসল রহস্য কি—সে কথা আমি বলতে পারি না। সে কথা আমার বলা সম্ভবও না। কেন কে জানে। কেন কে জানে।

ও সব দূরবর্তী ধোঁয়াটে বিষয় ত্যাগ ক'রে আমি সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি ভাবে ব্যাপারটাকে দেখবার চেষ্টা করব।

আমার কাছে আসবার আগে ও চলছিল আপনার একটা পথে। কিন্তু সে পথে ও যে ছিল ভরপুর এবং আনন্দিত সে রকম নয়। সেই পথে চলবার সময়ে ওর মনে হোত ওর ভেতরটা যেন ফাঁকা রয়েই গেছে। কি যেন কী ওর অন্তরে আসেইনি। সেই আসল বস্তু পাওয়া ওর যেন ঘটেইনি। কবে যে হবে তা কে জানে।

এই রকম যখন ওর মনের অবস্থা তখন কি রকম দৈবক্রমে আমার সঙ্গে ওর দেখা।

এখন আমি যে এসব লিখছি অথবা লেখাচ্ছি—এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়—এ সমস্তই বিধিনির্দিষ্ট। যা হবার ছিল তাই হয়েছে। যেন এই বিশ্বসংসার পথ ক'রে দিয়েছে। এই বিশ্বজগতের নাথ তাঁর ইচ্ছামত যা ঘটবার তা ঘটিয়েছেন। কারোর কিছুই বলবার নেই।

এই দীক্ষার ব্যাপারটিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞা-পারমিতার ত্যাগ এবং তপস্যা আর অন্তরের ধৈর্য এবং তিতিক্ষা—আর গভীরতা এবং সত্যানুরাগ। প্রজ্ঞা-পারমিতাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ এবং ধন্যবাদ। তার এগিয়ে চলাকে আমি বার বার জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

এই দীক্ষার ব্যাপারে আর একটু কথা আছে। ওর পিতার পরিবর্তনই ওর জীবনে এনে দিল একটা বিরাট পরিবর্তন। ও হঠাৎ একটা সময়ে তাকিয়ে দেখতে পেল ওর পিতার জীবনে এসেছে এক আশ্চর্য রদ বদল। এই পরিবর্তন কে ঘটালো? একটা মানুষ অন্য রকম একজন হয়েছে বা হ'তে চলেছে। তাই ওর অন্তরেই লাগল একটা জোয়ার। বিধির নির্দিষ্ট এই জোয়ার। বিধিরই ইচ্ছাতে যা ঘটবার ঘ'টে গেল।

রাধু মাতা

সংসারের পথে চলতে চলতে আমি কোথা থেকে কোথায় যে এসে পড়ি তার কোনো হিসেব পাই না। একটা কথা শুনেছি, মায়ার লাথি খেতে খেতে জীব এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিভ্রমণ করে। আমার কথা আমি বলি, আমি কখনো জীবনে মায়ার লাথি খাইনি। যা কিছু খেয়েছি আমার মায়ের লাথি। আমার মায়ের লাথি খেতে খেতেই আমার সংসার পথে অদ্ভুত পরিভ্রমণ।

সেই কবে থেকে যে খেতে আরম্ভ করেছি সে কথাও আমি আর

পরিষ্কার বলতে পারব না। আবার আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি আমার মায়েরই কোলে রয়েছি। অথচ মা নিজেই যেন দুঃখরূপে আমার কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সমস্তটাই একজনের কাণ্ড! আমি আমার ভাব দিয়ে বলতে পারি—এ এক অদ্ভুত চক্র গতি।

আমার চলার পথে আমি সহসা একদা পেয়ে গেলাম আমার রাধু মাতাকে। একটা রাস্তা—অজন্তা রোড। সেই অজন্তা রোডে অনেক বাড়ী। সেই অনেক বাড়ীর মধ্যে আবার একখানি বাড়ী। সেই বাড়ীর নাম দেওয়া হয়েছিল আরাধনা জগৎ। বাড়ীটির নম্বর ২২/সি।

একটি মোটরগাড়ি আমাকে নিয়ে এল হাওড়া স্টেশন থেকে একেবারে অজন্তা রোডে। গাড়িখানির হুড্ একেবারে খোলা। আমার উঠতে বসতে শরীরে কষ্ট ছিল। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমি একেবারে হাওড়া স্টেশন থেকেই নামলাম এসে ওই বাড়ীর সামনে। এই বাড়ীখানি আমাদের সারদাচরণ সোম বাবা তাঁর কন্যা রাধুকে দিয়েছেন। আমার কি রকম একটা ধাত আমি যেখানেই থাকি কোনো হিসাব না ক'রে আনন্দেই থাকি। আমি যেন আমার বাবার জায়গাতেই আছি।

চিরকালের বাবা আর তার চিরকালের ছেলে। আমার বাবার এই দুনিয়া। তাই আমারও এই দুনিয়া। এ সংসার আমারই সংসার অথবা আমাদেরই সংসার। সেই কবে থেকে এ সংসারকে আমি যত দেখতে পাচ্ছি আমি ততই আশ্চর্য হচ্ছি। আশ্চর্য হওয়ার মধ্যেই তো একটা আনন্দ রয়েছে।

এবার এসেছে এবং চলছে আমার রাধুমাতার কথা। রাধুমাতা যে আমাদের সারদাবাবারই সন্তান। যার সন্তানই হোক রাধুমাতা হচ্ছে রাধুমাতা।

আমি এদের মধ্যে এসেছি অনেকদিন হয়ে গেল। সাকুল্যে ৯/১০ বছর।

তারপরে শেষে রাধু এবং বুদ্ধের ঘটল বিবাহ। ওদের দুজনের সম্বন্ধ

বা সম্পর্ক রয়েছে অনেক আগের থেকেই। এসব কথা আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছি অনেক পরে। আমি আমার অন্তরের সরল সত্য কথা জানাই, সব দলেতেই আছি আমি, কোনো দলেই নাই। আমার জীবনটাই ওই রকম, কি রকম—এক রকম। সবের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। অথচ কারোর সঙ্গেই অথবা কোনো কিছুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্কই নেই। এখন কি করা যায়। এর তো কোনো উপায় নেই। আমি যে এই রকমই। এর থেকে না-এদিক, না-ওদিক। এর থেকে স'রে যাই কেমন ক'রে।

রাধুর কথা হচ্ছিল। রাধুর সঙ্গে আমাদের ভাবের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আজ নয়, অনেকদিন। রাধুর দেখা কয়েকটা স্বপ্নের ভিতরেই এটা ধরা পড়েছে। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে রাধু হঠাৎ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। রাধুর মুখেই সেই স্বপ্নের কথা আমরা শুনতে পেয়েছি এবং আশ্চর্য হয়েছি।

রাধু দেখছে: আমার ঘরে ('আরাধনা'র ঘরে) আমি ব'সে আছি। রাধু বাইরে রয়েছে। আমি ওকে ডাকলাম আমার কাছে।

রাধু একটু ভয় পেল। তার কারণ, আমার কাছে তো মেয়েরা কেউ আসে না। মেয়েরা আমাকে কেউ স্পর্শও করে না। এমন কি সে সময়ে আমার ঘরে মেয়েদের প্রবেশ করাও বারণ ছিল।

এমত অবস্থায় আমি ঘরের মধ্যে রাধুকে ডেকে এনে বলছি, রাধু, আমাকে ফুল দিয়ে সাজাতে পারবি? তারপরে সাজিয়ে আমাকে কিন্তু কোলে ক'রে নিয়ে যাবি এবং কোলে ক'রেই নিয়ে আসবি। সাবধান রাস্তায় কোথাও নামাতে পারবি না।

রাধুর তো শুনেই চক্ষু চড়কগাছ। এতবড় একটা মানুষকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে হবে: সে কি ক'রে হবে। অবস্থা তো দেখছি বিষম বেগতিক। সে যা হোক রাধু তো প্রথমে ফুল এবং ফুলের গহনা কিনে নিয়ে এসে আমাকে সাজাতে লাগল। মাথায়, গলায়, হাতে, পায়ে পরালো সব ফুলের গহনা। যেখানে যেমন সাজে তেমনই সাজালো।

সাজাতে সাজাতে চিন্তা করছে। মাথায় যখন ফুলের মুকুট পড়াতে যাবে তখন দেখে ছোট্ট গোপাল হয়ে গেছেন। কোলে নিয়ে দিব্যি রওনা হোলো।

কোলে নিয়েই ও প্রথম গেল অনন্তা মায়ের বাড়ীতে। এক পাশে অনন্তা মায়ের একটি বাড়ী। রাধু সেই বাড়ীর সম্মুখে আমাকে নিয়ে এসে উপস্থিত। আমি ডাকলাম, অনন্তা মা, কেমন আছিস ? অনন্তা মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আমি ভালই আছি।

তক্ষুনি আবার রাধু আমাকে কোলে নিয়েই রওনা হ'ল অন্য দিকে। এবারে রাধু গেল চিরন্তনী মায়ের বাড়ীতে। সেখানে একই ইতিহাস।

তারপর রাধু গেল প্রজ্ঞা মায়ের বাড়ী। প্রজ্ঞা মায়ের বাড়ীতেও সেই একই ব্যাপার। এখানেও এই রকমই কথাবার্তা। প্রজ্ঞা মাকেও ডাকলাম, প্রজ্ঞা মা কেমন আছিস ? প্রজ্ঞা মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাধুর কোলে ঠাকুরকে গোপালের চেহারাতে দেখতে পেয়ে প্রজ্ঞা মা দু হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, রাধু আমাকে একটু দে, আমাকে একটু দে। রাধুর কোলে ঠাকুর অম্‌নি ব'লে উঠলেন, না, চল্ রাধু, এগিয়ে চল্।

রাধু এইভাবে তিন বাড়ীতে ঘুরে আসবার জন্য তৈরী হ'ল। আমিও রাধুর কোলে চ'ড়ে আবার ফিরে যাচ্ছি সেই 'আরাধনা'য়।

'আরাধনা'য় পৌঁছে রাধু আমাকে বিছানার উপরে নামিয়ে দিলে। আমি তখন বললাম, রাধু, আমাকে এক গ্লাস জল দে তো।

আমাকে নামিয়ে দিয়ে এবং ঠিকমত বসিয়ে রেখে রাধু গেল টিউবয়েলের জল আনতে। জল নিয়ে এসে দেখল, বিছানার উপরে আর ছোট্টো গোপাল অভয়জী নেই। তার বদলে ব'সে আছেন প্রাপ্ত বয়স্ক অভয়জী। ঠিক যেমন তেমনই।

রাধুর কথা অনেক কথা। দুই এক কথায় শেষ ক'রে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

রাধুর দেখা আর একটি স্বপ্ন :—

রাধু বলছে—একবার ঠাকুর 'আরাধনা' থেকে শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। ঠাকুর যখন 'আরাধনায়' থাকতেন তখন অনেকেই আসতেন। গুরুভাই

বোনেরাও আসতেন, আবার আসতেন অন্যান্য অনেকেই। ঠাকুরের কাছে সেরকম কোনো ভেদ নেই। এ আপনজন, অমুকে পর—এই ধরনের কথা ঠাকুরের মনে উদিত হয় না। ঠাকুর অন্তরে অন্তরে সহজেই জানেন অথবা জেনে ব'সে আছেন—এই বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণী একান্তভাবেই আমার আপনজন। অনেকেই আসতেন তাদের মধ্যে আমাদের গুরুবোন যতীনদার স্ত্রী গৌরীদিও আসতেন। তিনি বেশ অসুস্থ হয়েছিলেন যখন ঠাকুর কাশীতে ছিলেন। তারপর ঠাকুর কলকাতায় আসার পর ঠাকুরের কাছে এসে দিদি সুস্থ হয়ে গেলেন।

একদিন স্বপ্ন দেখছি, ঠাকুর যে-ঘরে অনুষ্ঠান করতেন আমি সেই ঘরে কি একটা কাজ করছি। হঠাৎ দেখি, যতীনদা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। বলছেন, আজ কতদিন যাবৎ ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর হঠাৎ দেখি, যাদবপুর স্টেশনে ব'সে আছে। কিছুতেই বাড়ী আসবে না। বলছে, ঠাকুরের কাছে যাবে। আমি তাই ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, ঠাকুর তো শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। ওঁরা ঠাকুরের ফটোর কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই দেখি, ঠাকুর দরজার কাছে এসে হাসি মুখে দাঁড়িয়েছেন। আমি বললাম, ঠাকুর আপনি তো শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। এখন কিভাবে এখানে এলেন। ঠাকুর বললেন, আমি আর ইহজগতে নেই। তোদের যে বলেছিলাম যখনই আমাকে চিন্তা করবি তখনই দেখতে পাবি। আমি চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠতেই ঠাকুর মিলিয়ে গেলেন এবং পিছন থেকে এসে দাঁড়ালেন আমাদের গুরুমা সাদা থান প'রে। হঠাৎ ক'রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে।

পরিচ্ছেদ—২৬

আমার মনে প'ড়ে যায় সেই শিশুকালের কথা অথবা বালককালের কথা। ১১ নম্বর গুলু ওস্তাগর লেনে আমি অথবা আমরা রইতাম ছেলে-বেলার খেলাধূলায় মত্ত।

শৈশবে অজস্র আনন্দ এবং সেই আনন্দ নিয়েই দিনের পর দিন কাটানো। কেন যে রয়েছি, কেন—কোন্ কারণে যে দিনের পর দিন কাটিয়ে চ'লেছি সে সকল বিষয়ে যেন কোনোরকম হুঁশই নেই। অথচ দিনগুলো যাচ্ছে না এমন নয়। এই ১১ নম্বর বাড়ী থেকেই আমার শৈশবের কথা সব স্পষ্ট মনে পড়ে।

তার আগের জীবনে যখন আমরা ছিলাম সেই নিমগাছওলা একটা বাড়ীতে সে সব কথা বেশী কিছু মনে পড়ে না। পাশের বাগান বাড়ীর কথাও তেমন কিছু মনেই পড়ে না। একটু একটু কখনো কখনো যে মনে প'ড়ে যায় না এমন নয়। মনে পড়ে এক একখানি ছবি। মনে পড়ে মানে মনের ভিতরে কেমন ক'রে যেন উদিত হয়ে পড়ে।

মোটোদের ওই বাগানে একজন কামার লোহা লক্কর নিয়ে এবং হাঁপর নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কি সব কাজ করত আপন মনে। আমরা কখনো কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।

আবার বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে ঘরখানা সেই ঘরে আমার কাকা থাকতেন—এই রকম শুনেছি পরে। কাকার কী একটা বুকের অসুখ হয়েছিল। এই কাকারই স্ত্রী আমার কাকীমা অর্থাৎ ছোটো মা এখনো বেঁচে আছেন। আমরা যে-কয়-ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ কলকাতাতে থাকতাম তার মধ্যে এঁরাও অর্থাৎ ছোটো মায়ের বাপেরাও একটা ঘর। আমরা অধিকাংশই এসেছিলাম ঢাকা বিক্রমপুর অথবা ফরিদপুর-বরিশাল থেকে। কলকাতার এক অংশ তখন জমজমাট পূর্ববঙ্গের নানানরকম মানুষের আগমনে, অধ্যবসায়ে, চরিত্রগুণে, সহনশীলতায় এবং সকল রকম সৌন্দর্যে এবং মাধুর্যে। অবশ্য আমি বলছি না এসব জিনিস পশ্চিমবঙ্গেতে নেই। পশ্চিমবঙ্গেতেও আছে। এবং অঢেল পরিমাণে আছে। একটু খেয়াল ক'রে খুঁজলে পরেই পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবার পূর্ববর্তী কাল এবং পরবর্তী কাল—এ তো আমার চোখের সামনেই প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ববর্তীকালও দেখেছি আবার পরবর্তীকালও দেখলাম। আমার অন্তরের সেই জানা কথাটাই আবার

এখানে আর একবার উল্লেখ করছি। আমি ভগবানের ঘরের একটি মানুষ। এই বিশ্বসংসার ব্যাপী তাঁরই ঘর। তাঁর সেই ঘরেই আমি চিরকাল বাস ক'রে আসছি। আমি কি হিন্দু? নহি, নহি, নহি। আমি কখনো হিন্দু নই। তবে কি আমি মুসলমান? না, আমি মুসলমান নই। যেমন আমি হিন্দু নই তেমন আমি মুসলমানও নই। তবে কি আমি খ্রীশ্চান?

আমি খ্রীশ্চান হ'তে যাব কোন্ দুঃখে? হিন্দু আমি নই, মুসলমানও নই, আবার খ্রীশ্চানও আমি নই। শিখ অথবা বৌদ্ধ এসব কিছুই আমি নই। কোনো গণ্ডী দিয়েই আমাকে ঘেরা যায় না। তবে আমি কি? আমি যাহা আমি তাহাই।

ছেলেবেলায় মনে পড়ে, আমাদের একজন মাস্টারমশাই পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বলতেন এদেশেও অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও সমস্তই সুন্দর আর মাধুর্যময়। আমরা হাঁ ক'রে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের কাছে এক জায়গায় তিনি থাকতেন তেতলার উপরে একখানা ঘরে। একেবারে একলাই তিনি থাকতেন। আমি তাঁর সংসারের খবর প্রায় জানি না।

একদিন পড়াতে পড়াতে আমাদের স্কুলেই তিনি আমাকে বললেন, তুমি একখানা নতুন খাতা নিয়ে আসবে আমার কাছে। অমুক জায়গায় অমুক বাড়ীতে তেতলার উপরে একখানা ঘরে আমি থাকি। এত নম্বর আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে।

আমি তো সঙ্কোচে এবং ভয়ে একেবারে অস্থির। তারমধ্যে কিছু আনন্দও যে ছিল না এমন নয়। শুনেছি এই মাস্টারমশাই না কি নোট বই লেখেন বা লিখেছেন। তাহ'লে ইনি তো সাধারণ মানুষ নন। আমি class-এ প্রথম হই শুনে তিনি আমায় ডেকেছেন। এ তো খুব খুশির কথা। মনে আছে আমি খুঁজতে খুঁজতে তাঁর সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।

তেতলার উপরে একখানা ঘরে একটি খাটের উপর তাঁকে দেখতে

পেলাম। রাস্তাটা হয় আমহার্স্ট স্ট্রীট নয় তার সন্নিকটে কোনো এক রাস্তা। গিয়ে দেখলাম তেতলার একখানি ঘরে তিনি একলাই থাকেন।

রঙ্ তাঁর কালো। একটু বেশী রকমের কালো। তার উপরে তিনি একটু মোটা মানুষ। স্বাস্থ্য কিন্তু বেশ ভাল।

প্রথমটা আমি একেবারে লজ্জায় এবং সঙ্কোচে বিশেষভাবেই জড়ীভূত।

আমি গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম তেতলায়। তেতলার একখানি ঘরে আধুনিক রকমের সব ব্যবস্থা। খোঁজ করতে করতে অথবা জিজ্ঞেস করতে করতে আমি এসে পড়লাম মাস্টারমশাই-এর সেই ঘরটিতে।

ঘরে একখানি খাট। সেই খাটের উপরে আমাদের সেই মাস্টারমশাই সগৌরবে বিরাজিত। আমার সঙ্গে তিনি স্নেহের সঙ্গে আলাপ করলেন। একখানা খাতা কিনতে বললেন অথবা সংগ্রহ করতে বললেন।

আমি সেইমতই করলাম। তাঁর কথামত একখানি খাতায় তাঁর এই কোচিং ক্লাসের পড়া বা লেখা রাখতে আরম্ভ করলাম। মনে পড়ছে সেই খাতাখানা ছিল একটি বাঁধানো খাতা। বেশ ভালো খাতা।

সেই মাস্টারমশাই আমাকে যে রকম স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন আমি সেকথা আজও ভুলতে পারি না।

পরিচ্ছেদ—২৪

চিরন্তনী

তারপরে আসছে আমাদের চিরন্তনীর কথা। আমার আজকালকার ইতিহাসে দেখতে পাই আমার মা চিরন্তনী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রথম দিকে চিরন্তনী যেমন আসত তেমনই আসত আরো কয়েকজন। চিরন্তনীর মা, বাবা, ভাই, বোন, দিদিমা—এঁরা সবাই আসতেন। এঁরা সবাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুক্ত নন। যুক্ত ছিলেনও না অথবা পরেও যুক্ত হয়ে যাননি।

আমার কেমন একটা স্বভাব, আমি সব্বাইকেই খাতির করি, সকলকেই আপন ক'রে নিয়ে থাকি। কাউকেই আমার অন্তর দূরে ঠেলে রাখতে জানেও না, পারেও না।

কিন্তু বাইরের দিকে কিছু লোক আমার কাছে এসে কেমন ধারা আমার কাছেই থেকে যায়। কয়েকজন তো আমাকে আর ছাড়তেই পারে না। তাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সে সম্পর্কটা যেন চিরকালেরই। যেন তারা সবাই আমার আপনার লোক। চিরকাল ধ'রে ছিল, আছে আর থাকবে।

এদের বাদ দিয়ে আরো লোক তো আছে যারা আমার কাছে এসেছে। অনেকেই তো আমার কাছে আসে। ভালো কথা। যারাই আমার কাছে আসেন তাদের সকলের কথাই ভালো কথা—বেশ ভালো কথা ।

তারা সবাই যে ভালো। তাই সবাইকার কথাই ভালো কথা নিশ্চয়। আমার কাছে, আমার সম্পর্কে যাঁরাই আসবেন তাঁদের মধ্যে কেউ কোথাও কখনো খারাপ নয়। খারাপ হ'তেই পারে না। লোকের চোক্ষে কেউ কেউ হয়তো বা অন্য রকম। ব্যবহারিক দিক ব'লে একটা দিক রয়েছে। সেই দিক থাকলেও আমি বুঝতে পারি এবং বলছি, দেখতে পাই কেউ কোথাও কখনো কোনোভাবেই খারাপ পদবাচ্য হ'তে পারেন না। অর্থাৎ আমার দেখা এই জগতে খারাপ কিছু নেই।

এই যে বললুম, এই কথাটা একটা গভীর অর্থ বহন করছে। এই বিশ্ব হয়তো বা এতদিন ছিল এক রকম। এখন আমার দেখার পর থেকে আমার সত্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই অন্যরকম।

চিরন্তনীর কথা হচ্ছিল। চিরন্তনীর কথা একটুখানি আশ্চর্য কথা। কিছুকাল পূর্বে দোগাছির একটি ছেলে বলেছিল, আমি টাকা এনেছি—চিরন্তনীদির নামে থাক্ না ব্যাঙ্কে। চিরন্তনী রাজী হ'ল না। সেই টাকাটা এই 'জীবন-কথা'র তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলে সে।

তাই টাকাটাকে এই কাজেই দেওয়া হ'ল তারই ইচ্ছা অনুসারে।

আমি জানি, আমাদের কাজে যেখানকার যত টাকা আসছে এবং খরচ হয়ে যাচ্ছে সমস্তই সেই একজনের টাকা। আমাদের মধ্যে যে যতটা আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত – বুঝতে হবে সেইখানেই উপরওয়ালার ততটা প্রভাব। সমস্তটাই সেই তাঁরই কাজ—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু বলি, কোনো কোনো জায়গাতে তিনি আলোক বিকিরণ করছেন। তাঁরই খেলা। তাঁরই কাণ্ড চলেছে, চলেছে আর চলেছে।

মোটের উপর কথা এই, চিরন্তনী মা তার নিজের ধাতে তৈরী। তার গুণ, তার দোষ, তার ভাব সমস্তই একটা বিশেষ ভাবে, বিশেষ হিসেবে গড়া। কারোর সঙ্গেই কারোরটা মেলে না। এখানেও সেই রকম। অন্যান্যদের দোষ আর গুণ নিয়ে তার বিচারটা করতে যাওয়াই ভুল। তারটা তারই মতন।

আমি দেখতে পেয়েছি, চিরন্তনী তার নিজের হিসেবে আপন মনে বর্তমান। অন্যের সঙ্গে তার হিসেব মিলিয়ে ফেলবারই বা দরকার কি, গুলিয়ে ফেলবারই বা দরকার কি। সে তার মতই আছে এবং তার মতই চিরকাল থাকবে। অন্যের মতো সে নয়। এ কথা সব নিতান্তই জানা কথা। তবু একটা কথা বলতেই হয়, চিরন্তনী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকুক না আপনার ভাবে।

এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, চিরন্তনীর মতো ত্যাগ এবং তপস্যা, কষ্ট সহন এবং আদর্শের জন্য দুঃখ দহন এই যুগে নিতান্তই বিরল জিনিস।

পরিপূর্ণা

এবারে আসছি আমার একটি উজ্জ্বল মাতা পরিপূর্ণার প্রসঙ্গে। যেমন গানে তেমন ভাবে, যেমন কাজে তেমন কথায় আমার এই পরিপূর্ণা মা অনেক দিক থেকেই আশ্চর্য এবং পরিপূর্ণ।

অনেক সময় দেখেছি পরিপূর্ণা মা আমার হাসির গল্প নিয়ে বিশেষ ভাবে

ব্যস্ত। যখন বলতে আরম্ভ করে তখন আসর যেন জমজমাট। পরিপূর্ণার জীবনে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। সাংসারিক ধারাতে থেকেও সত্যকারের সাংসারিকতার ধার সে ধারেই না। যা কিছু বলছে এবং করছে সমস্তই যেন সাংসারিকতার উর্ধ্বে।

কেউ লক্ষ্য করে না। ওকে দেখতে পাই কেউ লক্ষ্য করতে চায় না। লক্ষ্য যদিই বা করে—সে একটা দিক এবং একটুখানিক। ওর ভাবটা বোঝা সাধারণ কথা নয়। ওর ভিতরে আছে real art. ওকে যদি কোনো একটা নাম দিই—সে নাম হওয়া উচিত সরস্বতী।

পরিপূর্ণার কাকা অর্থাৎ আমাদের সকলকার তনুকাকা

এবার তনুকাকার কথা বলি। ইনি পাইকারি কাকা। সর্বসাধারণের কাকা। এককালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেইকালে অবশ্যই তিনি নিত্য আসর জমাতেন। সে আমরা তার এখনকার ভাবভঙ্গী এবং চালচলন দেখেই বুঝতে পারি—যাকে বলে অনুমান করতে পারি। লোকটি জম-জমাট ধরনের লোক।

আমাদের পরিপূর্ণার ইনি আপন কাকা। ইনি যখন আমাদের আশ্রমে আসেন এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলতে থাকেন তখন অন্যদিকে মন দেওয়ার আর উপায় থাকে না। এ হেন তনুকাকার কথা বলছি এবার। আর কারোর কেমন লাগে জানি না, আমার তো খুবই my dear লাগে।

একদা যেতেন শান্তিনিকেতনে। এখানে থিয়েটারও পরিচালনা করেছেন। আমার সঙ্গে দেখা এই সেদিন। কী যেন কেমন ক'রে এসে গেছেন আমার কাছখানে। এখন যেন হয়ে উঠেছেন আমার গল্পের মানুষ অথবা গল্পের নায়ক। তাঁর কাছেই শোনা গেল তাঁর জীবনের এক বিচিত্র কাহিনী।

তিনি অনেক অনেকদিন ঘুমোতেই পারতেন না। ঘুমোতে গিয়ে দেখতে পেতেন ঘুম আসছে না। এ তো বড় মুশকিল হ'লো। কতদিন

এ রকম চলল। এ তো ভেলা বিপদ দেখছি। তারপরে আমার সঙ্গে দেখা। আমি যা হোক কিছু ব'লে দিলাম। পরাজয় স্বীকার করা চলবে না।

শেষকালে—অল্প কয়েকদিন বাদে দেখতে পাওয়া গেল তিনি বেশ তো ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোতে আর কোনো অসুবিধাই নেই।

ক্রমে তনুকাকা আমাদের একজন হয়ে যেতে দেরী করল না। দেরী করার জিনিস না। ওঁর কুষ্ঠিতে নেই হয়তো। আর একটি কথা। ইনি যেমন ঘুমের ওষুধ ছেড়েছিলেন তেমনই ছেড়েছেন সিগারেট। একদম ছেড়ে দিয়েছেন। সিগারেট নিয়ে কত মানুষের কত বিচিত্র কাণ্ড। সেই সিগারেট তিনি ছেড়ে দিলেন একপ্রকার এক কথায়। কেমন করে? সেই এক-জনেরই কায়দাতে।

ভবানী

ভবানী ব'লে আমাদের একটি মেয়ের কথা বলছি। সেই মেয়ে কিন্তু কম মেয়ে নয়। ভবানী আমাদের দারুণ মেয়ে। সেই যে মা কালী সম্বন্ধে একজন গান লিখেছিল, সে কি এম্‌নি মেয়ের মেয়ে। সেই গানের লাইনটা আমার এখানে ফট্‌ ক'রে মনে প'ড়ে গেল। সেই যে গো মা কালীর কীর্ত্তি কাহিনী। আর যা-ই বল, মা কালীর চেহারাটা কিন্তু বাস্তবিকই অদ্ভুত এবং অপরূপ। ছবিতে দেখেছি কিন্তু সেই ছবিতে দেখা মূর্তিই আমাকে একেবারে ডুবিয়েছে। আমার কিন্তু ওইরকম ধরনের ধিঙ্গিপনা খুব যে একটা ভদ্রস্থ লাগে তা কিন্তু নয়। ভদ্রকালী ব'লে একটা জায়গা আছে। আমার এদিকে মনে হচ্ছে, আমি যদি নাম দিই অভদ্র-কালী তাহ'লে কেমন হয়—কি বৃত্তান্তটা দাঁড়ায়।

আমার তো মনে হয়, এতে ক'রে কিছুই ক্ষেতি নেই। আমি যে মা কালীর আদরের দুলাল—সে কথাটা কি একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছেন?

যা বলছিলাম বলি। আমাদের ভবানী দেবী এদিকে সর্বঘটে

কাঁঠালী কলা নয়, একেবারে মর্তমান কলা। বর্তমান যুগে ঠিক এরকমটা আমার প্রায় চোখে পড়ে না।

ভবানীর কাহিনী এবার একে একে বলি। খোল বাজাতে আমার মা ভবানী নিতান্ত যা-তা নয়। খোল এবং করতাল দুইই। দাদরা এবং কাহারবা অথবা ওইরকম কোনো তাল মনে হয় ভবানী নিশ্চিন্তে চালিয়ে দিতে পারেন অবাধে এবং নির্বিবাদে। সেইজন্যে ভবানী দেবীর গৌরবে আমি গৌরবান্বিত। একটা দিক সামলাতেই কত time লেগে যায়। তা ভবানী কতগুলো দিক সামলায়। লোকে একটা দিকই সামলাতে পারে না। একটা দিকেই লোকে ধেরিয়ে যায় এবং ছেরিয়ে যায়।

ভবানী সম্বন্ধে বলতে গেলেই মনে পড়ে ওর একটা বিশেষ দিক—ফটো তোলা। একেবারে নিতান্ত বাজে ফটো নয়। ক্যামেরাটা অবশ্য ভাল ক্যামেরা হওয়া চাই। তারপরে? তারপরে আর কি। ভবানী দেবীর হাতে সুন্দর সুন্দর সব ছবি বেরিয়ে আসে।

মীরা

মীরার কথা এবারে বলি। মীরা কি কম? কে বলে মীরা ফ্যাল্‌না। মোটেই নয়। বড বড় কাজ ও উদ্ধার করেছে। কলকেতার রাস্তায় অনেকের এম্‌নিতেই মাথা ঘুরে যায়। মীরা সেইখানেই অবাধে এবং আনন্দে যাতায়াত করে—দরকারি জিনিসপত্র কিনে আনতে কসুর করে না। আমার সে ঋণ তো স্বীকার করতেই হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কত কত বই ও আমাকে কিনে দিয়েছে। বইয়ের প্রয়োজন পড়লেই আমি ওকেই পাঠিয়ে থাকি। মীরা, যা, তুই যা। তুই ঠিক পারবি। মীরাও কিনে এনে দিয়েছে। বই অধিকাংশই হয় আমি নিজে কিনি, না-হয় আমার এই মীরা সোনা কিনে এনে দেয়। এদিকে বেশ বুদ্ধিমতী কি না। কিনে আনতে ওর খুব একটা অসুবিধা হয় না।

শেঠজী

শেঠজীকে চিনতে পারছেন ? আমাদের সেই শেঠজী। সেই লিলুয়ার শেঠজী। আমি লিলুয়াতে গিয়ে একবার অথবা তুবার শেঠজীর বাড়ীতে ছিলাম। যেখানে থাকি আমি সেখানে আপনার ভাবেই থাকি। শেঠজীর বাড়ীতেও ছিলাম সেই রকমই আমার আপন ধরনে। এই সেদিন আমার কাছে এসেছিল সুশান্তা মা। সঙ্গে আরো তুটি একটি লোক।

সকলকেই আমার আপ্যায়ন। তা যাক্। যে কথা বলছিলাম সে কথায় আসি। তখন আমাকেও আপ্যায়ন জানালেন শেঠজী প্রভৃতি। কয়েকদিন সেখানে রইলাম। শেঠজীর সহধর্মিণী সুশান্তা মায়ের কিছু অসুখ করেছিল। সেই অসুখ উপলক্ষ্যেই ওখানে যাওয়া।

দিনকতক গেল সেই ব্যাপার নিয়ে এবং অন্য অনেক ব্যাপার নিয়ে। এই ব্যাপারের আগে কিংবা পরে, সে কথা এখন মনে নেই। আমি লিলুয়াতেই কাটিয়ে দিলাম অমূল্য আমার আপন জীবনের কয়েকটা দিন। এখানেও শেখবার আছে বিস্তর। শেখবার নেই কোথায় ? সর্বত্রই শেখবার আছে। জীবন ভ'রেই শিখিবার বস্তু। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, সখী, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।

তারপরে ফিরে এলাম আপন ডেরাতে। এখন শেঠজীর সম্বন্ধে আরো তু চার কথা ব'লে নেব। শেঠজী ছিলেন তাঁর ধরনে অতিশয় একজন ভালো লোক। মানুষের জীবনে তো অনেক সময় বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে—সেই রকমই কিছু ঘটলো। শেঠজীর লিলুয়ার বাড়ীতে একবার এসে পড়লো একদল তুষ্ট লোক—যাকে বলে ডাকাত।

যা হবার তাই হ'লো। আমার মনে পড়ে, একবার আমি বলেছিলাম, শেঠজী, তুমি আমার কাছে আসতে পার। যদি আস তবে আমি অনেক কিছু শেখাতে পারি। তুমি আমার কাছে শিখতে চাও তাই আমি তোমাকে বললাম। কিন্তু নানান কারণে শেঠজীর পক্ষে সেটি আর হয়ে ওঠেনি।

শেঠজী অনেকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সে সাহায্য

বাইরের দিকেই। শেঠজীর দান অথবা সাহায্য আমি আজও এখনো স্বীকার করি। বাইরের দিকে হ'লেও আমাকে স্বীকার করতেই হয়। আমার কাজ আমি করব না ?

তারপরে একদা শেঠজীর বাড়ীতে চড়াও হ'লো একটি দুর্বৃত্ত অথবা অন্যায়কারীর দল। তারা মারপিট ক'রে যা নেবার নিয়ে চ'লে গেল। তারপর আর কি। আমার সঙ্গে তারপরেও শেঠজীর দেখা হয়েছে।

শেঠজীর কথা শেষ করবার আগে আরো অল্প কিছু বলবো। ঠিক আগে পরে মনে নেই ; শেঠজী আমাকে নিয়ে একবার পুরী গিয়েছিলেন। সমুদ্রের তীরে আমরা কত যে খেলা এবং আনন্দ করতাম তার হিসাব দিতে পারব না। সে সময় আমি এক আধবার জগন্নাথ দেবের দর্শন হয়তো করতাম। চিরকালই সমুদ্রের তীরেই আমার বিশেষ আনন্দ, এমনকি দারুণ আনন্দ।

অবশ্য জগন্নাথদেবকে দেখতে আমি কখনো না গিয়েছি এমন নয়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমি খুঁজে পাই না সেখানে ওইরকম কেহ আছেন কি না। আমার ঠাকুর অথবা আমার দেবতা আমার কাছেই রয়েছেন। আমার সম্মুখে বললেও আমার আপত্তি নেই, আমার অন্তরে বললেও আমার আপত্তি নেই।

একমাত্র একজনই আছেন। সকল হয়ে, সকলকে নিয়ে আবার সব ছাড়িয়ে মাত্র একজনই বিরাজমান। যেমন বল তেমনি। যেমন ভাবে বল তেমন ভাবেই। বিবিধ এবং বিচিত্র—অনাদি এবং অনন্ত সেই তিনি বিরাজমান। অন্তর্মুখ হ'লেই আনন্দ। অন্তর্মুখ হ'লেই সেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে কোনোই কথা নেই। কেবল একটি বিষয়ে একটি কথা আমার কাছে এখনো বাকি আছে। প্রতি বস্তুর সঙ্গে প্রতিটি বস্তুর সেই অদ্ভুত সংযোগ অথবা সম্বন্ধ—সেটি কোথায় গেল। সে যেন এই ছিল এই নেই। হারিয়ে যাবার বস্তু সে তো নয়। সে কেন চ'লে যায়। সে কেন হারিয়ে যায়। তার দেখা কেন পাই না। পাই যদি তবে সকল সময়

তো পাই না। তাই আমি বলি, সেই ব্যক্তি যায় কোথায়। ছিল যদি তবে যায় কোথায়।

তবে কি এই রকমই! এইখানেই কি শেষ কথা। আর কি কিছুই নেই। জীবনের শেষ দিকে রয়েছে কি এতবড় একটা প্রবঞ্চনা?

সেই একজন। সেই একজনের কথাই আমি বারে বারে বলতে চেষ্টা করি। হেরে যাই। তবু আমার প্রচেষ্টা সেই একজনের দিকেই। চলেছে, চলেছে। হয়তো আরো চলবে। কতকাল চলবে কে জানে। আমার তো মনে সংকল্প—একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে ছাড়ছি না।

শেঠজীর কাহিনী শেষ ক'রে দেওয়ার পূর্বে আরো গোটাকতক কথা ব'লে নিতেই হয়। আমি একদিন শেঠজীর সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে খুব একটা ঝাঁপাইঝুড় করছিলাম। যা হচ্ছিল সেই জিনিসটা দুর্দান্ত এবং নিতান্ত। জেলেদের নৌকো জলের মধ্যে মোচার খোলার মত উঠছিল আর নামছিল, ডুবছিল আর ভাসছিল, উঁকি মারছিল আর লুকিয়ে পড়ছিল। আমরা এই সমস্ত নিয়েই খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলাম।

একদিন এই রকম চলতে চলতে আমি দেখতে পেলাম আমি একটা দুর্নিবার টানে ভেসে চলেছি। কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছি। তারপরে শেষে নুলিয়ারা গিয়ে আমাকে সামলে সুম্‌লে নিয়ে আসতে পারল। এইভাবে আমরা বেঁচে ফিরে এলাম।

অনেক অনেক মানুষ রয়েছে। সবাই মামুলী মানুষ। তার বেশী তো কিছুই নয়। জগতে কোটিতে গুটি আছে যারা মামুলী নয়, মোটেই মামুলী নয়। তাদের দিকে তাকিয়েই আমি আমার ইচ্ছামত কথা ব'লে যাই।

কাগজের পর কাগজ লেখা হচ্ছে। কোথায় লেখা হচ্ছে? বাইরে খাতার উপরে লেখা হচ্ছে। আবার অন্তরেও লেখা পড়ছে।

শাশ্বতী মা (অণিমা দেবী)

এবার আমি লিখছি আমার একটি অত্যন্ত প্রিয়জন সম্বন্ধে। বাইরের দিকে তার যে খুব ভাল একটা চেহারা ছিল এমন নয়। গভীর বিষাদের সঙ্গে সেই মহিলাকে স্মরণ ক'রে চলেছি। শেষকালে তার হয়েছিল একটি breast-এ cancer. আমি তার বাড়ীর সামনে দিয়ে চ'লে যেতাম। কিন্তু সেই মহিলার কাছ থেকে একটা আন্তরিক স্নেহ এবং ভালবাসা আমাকে যেন ঘিরে থাকত। ধ'রেও থাকত। তার কালো চেহারার মধ্যে আমি যেন আমাকেই খুঁজে পেতাম।

সেই মনে পড়ে একবার আমি তার বাড়ীর সামনে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছি। তাঁদের বাড়ীর লোকেদের আমার প্রতি তেমন কোনো আহ্বান ছিল না। তাই আমিও বেশী একটা ঢুকতুম না। সেই বাড়ীর একজন ভারতবর্ষের বাইরে থাকত। আমেরিকায় থাকত শুনেছি। একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাশীতে। তাকে নিয়ে অনেকক্ষণ রিক্শোতে আমি রাস্তায় ঘুরেছিলামও। সেই ছেলেটি আমাকে একবার দুইশত টাকা দিয়েছিল উৎসব উপলক্ষ্যে উপহারের ছলে। এখনো সে কিছু কিছু দিয়ে থাকে।

তার মায়ের মত গভীর আন্তরিক ভাব আর তো বেশী খুঁজে পাই না। তার মাকে আমিও মা ব'লেই ডাকতাম। তার প্রসঙ্গ আমি এখানেই শেষ করছি। শেষ করবার আগে আর একটি কথা ব'লে না নিলে চলছে না। দুর্বিষহ ছিল তার শরীরের একটা যন্ত্রণা। এখনো মনে পড়ে সে জানলায় ব'সে থাকত তার কষ্ট নিয়েই আমাকে দেখবার জন্য হয়তো।

আমাদের শিশিরদা

পরম আপনজন এই আমাদের শিশিরদা। এ ছাড়া আর কি বলব। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে গেলে বোধহয় এ কথাই বলতে হয়।

শিশিরদার সম্বন্ধে যখন কোনো কথা বলতে যাই তখনি কেবল এই কথাই মনে হয়—এমন বিচিত্র সুন্দর মানুষ এই সংসারের জগতে আর তো বেশী চোখে পড়েনি। শিশিরদার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সে তো আজকের কিছু নয়। সেই কবেকার থেকে শিশিরদার সঙ্গে বিচিত্র এক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে ব'সে আছি।

এ সম্বন্ধ বোধহয় প্রচলিত সকল সম্বন্ধের অতীত। আমার দিক দিয়ে বলি, প্রচলিত কোনো কিছুই সেই চাপে প'ড়ে স্বীকার ক'রে নিতে আমার অন্তর যেন বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রচলিত হিসেবের আমি কোনো মানুষই নই। আমার এই জীবনের দিক দিয়ে প্রচলিত কিছুই আমি মানিও না, মানতে চাইও না। আকাশে গ্রহের সঙ্গে গ্রহান্তরের যে আশ্চর্য স্বাভাবিক টান আপনা আপনি বিদ্যমান থাকে সেই টানই বুঝি অনুক্ষণ আমার জীবনে কাজ ক'রে চলেছে। আমাদের শিশিরদার উপর আমার যে একটা সুগভীর শ্রদ্ধা বরাবর কাজ করছে সেইটিকেই আমি যেন চিনতে পেরেছি—সেইটিকেই আমি চিনি। বাস্। আমার আর কোনোরকম হিসেবের প্রয়োজনই নেই।

অনেক কথা আছে। তার ভিতরে বড়ো কথা এইটি, এতো লোকের জীবন, জীবনান্তর, মত, মতান্তর নিয়ে যার কারবার তিনি কি সহজ একটি লোক। এই রকম একখানি অপরূপ সুন্দর পত্রিকাকে তিনি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই কবের থেকে। আজও সেই চলমানতায় কোনোরকম ভাঁটা পড়েনি।

শিশিরদাকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। অনেকদিন, অনেকমাস, অনেক বৎসর। সেই ভুবনেশ্বরের কথা। আবার সেই রায়পুরের কথা। আবার কত জায়গার কথা। সেই সব কথায় এসে পড়ে আমাদের মা আনন্দময়ীর কথা। মাতা আনন্দময়ী সেই যুগে এবং অন্য যুগেও আমাদের ক্ষেত্রে বিরাজ করতেন ঠিক যেন মেরুদণ্ডের মতো। মেরুদণ্ড যেমন সবাইকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মা আনন্দময়ী সেই রকম অনেককে অথবা সকলকে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে অবলম্বন ক'রেই সবাই

থাকত। অনেক বড় বড় মানুষ ছিলেন সে সময় এবং সেই ক্ষেত্রে। কিন্তু মা আনন্দময়ী যে ছিলেন—সে থাকা একেবারে অন্যরকম। মা ছিলেন অনেকটা যেন আকাশের চন্দ্রমার মতো।

সেই সময়ে আমাদের শিশিরদাকে পেলাম আমাদের মধ্যে অনেকটা যেন হঠাৎ ক'রেই।

এই সময়ে আরো কত কত লোক যে এসেছেন আমাদের কাছে—তার আর অন্ত নেই। কত সাধারণ অসাধারণ, কত আশ্চর্য আবার মামুলী সে কথা কে বলবে।

শিশিরদা এসেছিলেন। এসেছিলেন কিন্তু সকলের মধ্যে হারিয়ে যাননি। কত কত ঘটনা, কত শত ঘটনা।

শিশিরদার সমসাময়িক আরো কতজন এসেছিলেন সে তো আমি দেখতে পেয়েছি।

অনন্তার মাতা

আমাদের অনন্তার মা এক আশ্চর্য চরিত্র। তিনি আমাদের মধ্যে কাজের সূত্রেই ছিলেন এমন কথা বলতে পারি না। তবে একটা হিসাবে অনেকেই তো আমাদের ভাবজগতে বাস করতেন। অনন্তার মাকে তো বিশেষ ভাবেই সেই জগতের বাসিন্দা দেখতে পেয়েছি। আমাদের ভাব তো যেন মাকড়সার জাল। হয়তো কিছুই না। তাও গিয়েছে অনেকটা দূর।

একটা হিসাব আছে। অনাদি অনন্ত এই জগতে যাঁরাই আমার কাছে এসে পড়েছেন সকলের কথাই এই সূত্রে যেন এসে পড়ে। যাঁরা এই-ভাবে এসেছেন তাঁরা কেউ তো ফালতু ন'ন, কেউ তো উড়িয়ে দেবার মতো ন'ন—এ কথা আমি কেমন ক'রে উড়িয়ে দেব। উড়িয়ে দেবনা, বরঞ্চ কুড়িয়ে নেব এবং ঝুলিতে ভরব।

অনন্তার মা শেষদিকে এসে আমাদের কুটীরেই থাকতেন কখনো

কখনো। এমন একজন ভক্তিমতী ঈশ্বরপরায়ণা মহিলা আমি খুবই কম দেখেছি—এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি।

আমি বলতে গেলে শত কাজের মানুষ। তবু আমি সুযোগ পেলেই গিয়ে হাজির হতুম অনন্তাদের বাড়ীতে নব রায় লেনে। সেখানে অনন্তার মায়ের সঙ্গেও দেখা প্রায় অবশ্যই হ'তো। তিনি রামদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যা। রামদাস বাবাজী মহাশয়কে কে না চেনে। এই যুগে তিনি যে সর্বজন-পরিচিত বিশাল এক ব্যক্তিত্ব। নাম দিয়ে গড়া ছিল তাঁর জীবন। নামে নামে তিনি একেবারে নামময় হয়ে আনন্দে বিচরণ করতেন। নাম বিলানোই ছিল তাঁর স্বভাব।

অনন্তার মা ছিলেন আমারও যেন মাতা। এমন একটি মহিলা কই বেশী চোখে পড়ে না। কত লোকই তো দেখি। কত মা, কত বাবা, কত কেউ। কই ভক্তিমতী অথবা যাকে বলা যায় আনন্দময়ী তেমন মহিলা আমার তো তেমন একটা চোখেই পড়ে না। এই যুগটা কি অন্যরকম হয়ে গেল। ভেবে ভেবে আর কূল পাই না।

অর্চনা

অর্চনা এক অদ্ভুত মেয়ে। অদ্ভুত এবং বিচিত্র। কলিকাতার বাসিন্দে নয় কিন্তু। তবু তার আশ্চর্য জীবন-গতি একেবারে অবাক ক'রে দেবার মতো।

তার দু হাতে শাঁখা-পত্র কিছুই নেই। কিছুই নেই তো একেবারে কিছুই নেই। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী এবং জীবন মোটেই সাধারণ মেয়েদের মতো নয়। অন্যরকম, অন্যরকম, একেবারেই অন্যরকম।

সে বিবাহিত নয়। তাই শাঁখা সে পড়ে না। কিন্তু চুড়ি অথবা রুলি? কই কিছুই তার হাতে নেই। সে যেন এই সকলের অতীত ভূমিতে রয়েছে। ভাইবোন রয়েছে কয়েকজন তার।

তার মাকেও তো দেখেছি। সেই মহিলাও বেশ চমৎকার মহিলা। অর্চনার একটি ভাই-এর কথাও জানি। সেও ওই এক পথেরই। অন্য পথের বা অন্য ধারার সে ব্যক্তি নয়। লোকে মনে করতে পারে, যারা আমাদের পথে দীক্ষা গ্রহণ করেছে আমি তাদের একটু অন্য চোখে দেখি। সে কথা তো ঠিকই কথা। এর মানে এই নয় যে আমি তাদের সঙ্গে তেমন ভাবে কথা বলি না অথবা তাদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারও করি না। অর্থাৎ কি না যারা আমার সন্তানরূপে এসেছে তাদের একটু অন্য চোখে দেখি।

সে-সব কথা মোটেই হচ্ছে না। যার সঙ্গে কোনো-না-কোনো প্রকারে আমার বন্ধন সেখানে আমি তো নিরুপায়। একেবারেই নিরুপায়।

বাইরের দিকের কথা বলছি না কিন্তু। যেখানকার কথা বলছি সেখানে আমি যে একেবারে ধরা প'ড়ে গেছি। অন্তরে অন্তরে আমি তাদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। কে কি করবে ?

সকলেই ভালো। ভালো কে নয় ? তবু একটু ব্যাপার আছে। আমার সঙ্গে যাদের যাদের একটা গভীর সম্বন্ধ আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি তাদেরকে আমি একেবারে উড়িয়ে দেব সে কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয়। মূলে এই বিশ্বে সবাকার সঙ্গেই আমার যে যোগ। সেই যোগে আমি যুক্ত। বিশ্বের সঙ্গে, সমস্তের সঙ্গে, সকলেরই সঙ্গে আমি যে যুক্ত—নিত্য যুক্ত। তবে কি না আরো একটুখানি কথা মাঝখানে রয়েছে। যে-ব্যক্তি এই খাঁচাটির কাছে দীক্ষিত সে যেন আর একটা ধাপ পেয়ে গেল। আমি যেমন সকলের মধ্যে থেকেও একেবারে একাকী সেও সেই রকম। আমার স্বভাবটা বুঝি সেইখানেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

অনাদি অনন্ত বিশ্বে একটি কথা এই, কিছু জেনেও আমি সব জানি, আমি সমস্তই বুঝি, কিন্তু আমি তোমাদের সে কথা বোঝাতে পারব না।

শিপ্রা

একটি মেয়ে। নাম শিপ্রা। আমার কাছে তো অতি অবশ্যই ভালো। ভালো মানে বেশ ভালো।

আমার অনেক কথা মনে পড়ছে। আমার কাজের জন্য কত তার ত্যাগ স্বীকার।

এদের না হ'লে তো আমার কাজ এগুতোই না। দেখেছি আমার শিপ্রা মায়ের অনেকবার অনেক কথা, অনেক কাজ আর অনেক ভাব। তাই আমি এদের সকলেরই কাছে নিতান্ত প্রকারে ঋণী।

লেখা

'লেখা'র সম্বন্ধে লেখা। আমি নাম দিলাম লেখামণি। লেখামণি অল্পদিন হ'ল আমাদের এই ভাবধারার মধ্যে এসেছে। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই, কী তার আগ্রহ, কী তার সেবাতে আনন্দ। সে কাজ করে অনেকগুলো দিক দিয়ে। যেটা সহজে পাওয়া যায় না সেটা সে কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন সংগ্রহ ক'রে দেয়।

আসল কথা অন্তরেতে তার দেখতে পেয়েছি ভালোবাসা। ভালোর প্রতি তার যে বাসনা সেইটাই ভালোবাসা। তাকে আমি জানাচ্ছি আমার প্রাণের গভীর ভালোবাসা। এতেই আমার আনন্দ।

নমিতা মা

আমাদের নমিতা মাও একজন খুব কম পাত্র নয়। তার জীবন গ'ড়ে উঠেছে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে, অনেক সুখ দুঃখের দোলাতে। তাকে প্রথম আমি লক্ষ্য করেছি সেই কাশীতে আমাদের মা আনন্দময়ী আশ্রমে। সে কি আজকের কথা। তখন তার স্বামী অর্থাৎ আমাদের বিধুবাবু বর্তমান।

অনেক বৈচিত্র, আশ্চর্য সৌন্দর্য। আরো আশ্চর্য এই মহিলার জীবন-চর্যা। মোটের উপর কথাটা এই, আমি নমিতা দেবীর আলোকে আনন্দিত এবং মুগ্ধ। সব সময়ে সে দেখি আস্তে কথা বলে এবং পুস্তকের পরে পুস্তক পাঠে নিরত। তাই আমার অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে আশীর্বাদের ধারা তাকে ঘিরে নেমে আসে।

যমুনা দেবী

জানি না ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। যমুনা দেবী সেই কোন্ যুগে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার অনেক ভাবের ভিতর দিয়ে তাঁর সাহচর্য আমি দেখতে পেয়েছি। আমার আছে অনেকখানি আশা—কিছু পরিমাণে ভাষা, আর অন্তরের গভীর একটা অভিলাষা।

ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমার জীবনে সর্বদাই সকলখানেই সর্বতোভাবেই শেষ কথা। এইখানেই আমার গভীর একটা গৌরব আর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে-আসা আনন্দময় সৌরভ।

যমুনা দেবী আমার জীবনে অনেক কাজ করেছেন। ভালো ভালো কাজ। আমি সেই চরম এবং পরম সত্যের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখন অবাক হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না আমার।

অনেক অনেক বিষয়ে আমার অনেকের সঙ্গে—এমন কি বিশাল বিশাল অনেক সংস্থার সঙ্গেও মতবিরোধ বা মতভেদ ঘ'টে যায়। তা ঘটে ঘটুক। সেখানেও আমি আমার ভাবজগতে আনন্দে থাকি শত অভাবের ভিতরেও, নানাপ্রকার ভাবের, বৈচিত্র্যের সমাবেশেও। আমার সকলের কাছেই প্রার্থনা, তোমরা আমাকে সাহায্য কর অথবা আশীর্বাদ কর, যাতে আমি আমার সেই সত্য পথ অথবা রাজপথকে ধ'রে থাকতে পারি। যখন শেষ প্রান্তে পৌছব তখনো আমার এই গতি যেন অব্যাহত থাকে।

দীপান্বিতা

আমার আর এক কন্যা দীপান্বিতা। পড়াশোনায় ভালো। গানে বাজনায় ভালো। আচার ব্যবহারে ভালো। কথা-বার্তায় ভালো। ভালো, ভালো—কত বিষয়ে যে ভালো, তা আমি বলতে পারব না। সেই দীপান্বিতা আমাদের অনেক কাজ করেছে। তার জীবন সুখে এবং শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক এবং তেমনই থাকুক। এই রকম আমি চাই।

শান্তিবাবা

শান্তিবাবা একজন এমন মানুষ—যেখানে গভীর আন্তরিকতা এবং প্রচুর গুরুভক্তি একত্রে এসে মিলেছে। আমাদের শোভা—যাকে আমি অনেক সময় ডাকি শোভা মা ব'লে—সেই শোভার তিনি ছিলেন স্বামী। এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্। আমি এখানে কোনোরূপ মত মতান্তর না ব'লে নিজের পথেই এগিয়ে চলব।

দুজনেই আশ্চর্য ব্যক্তি। দুজনেই খুব পরিচ্ছন্ন। অতীতকালে আমার শান্তিবাবা এবং বর্তমানকালে আমার শোভা মাতা।

শোভা মায়ের বাড়ীর কাছে জনৈক বাজে type-এর ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর যথেষ্ট অবিচার এবং অত্যাচার করত। সে পাড়াতে যেন এক তুলকালাম। শোভা বুদ্ধি ক'রে এমন এক সমাধান বের করল—যার ফলে সমস্তই মিটে গেল। তারপরে এখন সমস্ত চুপচাপ। সব একেবারে শান্ত। চতুর্দিকে ভদ্রজনোচিত এবং সুন্দর আবহাওয়া।

করুণাংশু বসু রায় চৌধুরী

যার কথা এবারে লিখতে যাব সেই ব্যক্তি আমার কাছে দীক্ষিত ন'ন। তবু আমার বেশ ভালবাসার পাত্র এবং বিশেষ স্নেহের মানুষও বটেন।

তাঁর নাম শ্রীকরুণাংশু বসু রায় চৌধুরী। তিনি আমার কাছে আসেন সে অনেক দিন থেকে।

বড়লোকদের আমল দিই না। কিন্তু বড়লোক হ'লেই যে, কোনো মানুষ একেবারে গোল্লায় গেলেন এমনও তো নয়।

তাই বলছি, আমাদের করুণাংশু বাবাকে ঠেলে ফেলতেও পারি না, উড়িয়ে দিতেও পারি না। সৎকর্মে এবং শুভ কর্মে তাঁর অন্তর একেবারে অবারিত। আর আমার কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকবার দেখেছি তিনি এগিয়ে এসেছেন আনন্দে এবং আহ্লাদে।

বিষয়টা আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে। বার বার কত বার। আমি যেন বড়লোক ঘেঁষা না হয়ে যাই। সকল জনের সঙ্গেই আমার যে সম্বন্ধ পরিষ্কার এবং নিশ্চিত। সকলকে নিয়েই যে আমার কারবার। কোনো একটি মাত্র দলকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারিও না, জানিও না।

আমার কথার মধ্যে আর একটি কথা আছে। আমার লেখা গান প্রায়ই আমার মনের কাছে সাড়া জাগিয়ে যায়। এ তো শুধু আজ নয়। এমনকি অনেক কাল এবং চিরকাল।

আমার স্নেহের করুণাংশুবাবা আমার গানকে ভালবাসে এবং বড় একটা আসন দেয়—এইটাই আমার কাছে বিশেষ একটা কথা।

শুধু করুণাংশুবাবা নয়, তাঁদের বাড়ীর সকলেই প্রায় ওই একই ভাবে ভাবিত। যেখানেই সুন্দর ভাব, আন্তর গভীর আন্তরিকতা সেখানেই আমার প্রাণটা যেন গিয়ে শামিল হয়ে পড়ে।

অনুভা

এবারে অনুভা। বড়ই আশ্চর্য মেয়ে অনুভা। ও ওপারে কোথায় যেন চ'লে গেছে। সে কথা আমি বলতেই পারি না। কতদূরে, কোন্ সুদূরে।

আমার মা, ওরে আমার মা রে, তুই এখন কোথায়? তুই আমার

কাছে অথবা তুই দূরে ? তুই আমাকে বল্ মা, তুই এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিস।

সেই একবার শান্তিনিকেতনে তুই ব'সে আছিস মা, আমি তোর কোলে আমার মাথাটা দিয়ে শুয়ে পড়েছি।

তারপরে কত কথা, কত কাণ্ড। আমাদের আশ্রম হয়ে গেল। সেই আশ্রমে আমরা গিয়ে থাকতাম। আজও থাকি।

সমস্তই ঠিক। কিন্তু এমন একটা মেয়ে তো আর দ্বিতীয়বার দেখলাম না। আমাদের অনন্তার ভ্রাতুস্পুত্রী। আমাদেরই তো মেয়ে। সেই সুন্দর কথা বলা—সেই আশ্চর্য গান গাওয়া, সেই সুরের জালে জালে জাল বোনা।

হঠাৎ সেই গাছের শ্যামল সুন্দর ডালপালাতে যে যেন আগুন লাগিয়ে দিল। আমাদের ভালো জিনিস নিমেষে যেন কালো হয়ে গেল। আমার মা অনুভা কোথায় যেন চ'লে গেল। আমি আর তাকে দেখতে পাব না।

অনুভা, আমার অনুভা মাগো, কোনখানে তুই হারিয়ে গেছিস সেইটে আমাকে একবার ব'লে দে না। কোকিলের মতো তোর সেই কণ্ঠ আমার কাছ থেকে কি দূরে স'রে গেছে ? অনাদি আর অনন্তের মধ্য হ'তে যে জেগে উঠেছিল আবার সেই অনাদি আর অনন্তের মধ্যেতেই সে নিভে গিয়ে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মা, তুই কোথায় ? কোন্‌খানে এবং কত দূরে। আমার মনে মনে আমি কি জানি যে, আমার সেই মাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো প্রাণের মধ্যে বুঝে পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমি অবুঝ। আমি ওরকম বুঝতেই চাই না। আমি শুধু একবার দেখতে চাই। আমার সেই মা জননীকে একবার দেখে আমি আমার খেদ মিটাব। সেইটেই কেমন ক'রে হয়।

আরো কিছু কথা এলে পরে সে তো আমার লিখতেই হবে। এখনকার মতো এখানে শেষ করি।

———